# বিষয় দাম্পত্য

প্রলয় সেন

মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রকাশক :
শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ—১৩৫৯

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
তিলোত্তমা প্রেস
১০, নরসিং লেন
কলিকাতা - ৯

যাদের উষ্ণ সাহচর্য জীবনের অনেক বন্ধুর পথ মসৃণ করেছে

সেই

সুব্রত রুদ্র

প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়

মৃণাল গুহঠাকুরতা

এবং

অধীর মুখোপাধ্যায়-কে

ক্রম

সীমানা ছাড়িয়ে | ১
আশ্রয় | ১৯
পাতাবাহার | ২৯
রক্তের ভেতরে সমুদ্র | ৩৮
পুরুষ | ৬১
বিষয় দাম্পত্য | ৭২
অলীক | ৮২
রাজা | ৯০
খুনী | ৯৮
মানুষ | ১১৫
জোড় | ১২৮
ছবি | ১৪১
টানাপোড়েন | ১৫০

এই লেখকের

পটভূমি　তালপাতার বাঁশি　সীমাস্বর্গ　কয়েদখানা　সনাক্তকরণ
চৈত্রদিনের খেলা　চিহ্ন　দুরন্ত হার্মাদ　সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর　ভুতুড়ে গল্প
সীতা　কাফকার গল্প　অভিশপ্ত চুনার ইত্যাদি

বিষয় দাম্পত্য

# সীমানা ছাড়িয়ে

কামরায় উঠেই জানলার কাছের একটা সীট দখল করল গোপা। রমেন তখন মানিব্যাগ খুলে কুলির পাওনা চুকিয়ে দিচ্ছে। গোপা প্রয়োজনমত শাড়ি টেনেটুনে আঁট করে বসল। জানালায় কনুই বিছিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। ওদিকে রমেন মালপত্তরের হিসেব মেলাচ্ছে। একবার গোড়ালি উঁচু করে বাঙ্কের দিকে গলা বাড়াচ্ছে, আর একবার হাঁটু ভেঙে ঝুঁকে সীটের তলা দেখছে। ট্রাঙ্ক-সুটকেস হোল্ডঅল বেতের ঝুড়ি ফ্লাস্ক—গোনাগুনতি শেষ করে এসে বসল গোপার মুখোমুখি। পকেট থেকে সোনা-রঙের সিগারেট-কেসটা বের করে বলল, উফ্, বাইরে বেরুনোর যা ধকল, আগে জানলে—। রমেনের কণ্ঠস্বরে বিরক্তির লেশমাত্র ছিল না, বরং আত্মপ্রসাদের। গোপা তখন বাইরের দিকে পলকহীন তাকিয়ে। সেই পুরনো ছবি। নানান মাপের লোকজন। কেউ চলছে কেউ বা অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। একটা ফেলে-আসা স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে।

কামরায় তৃতীয় প্রাণী বলতে এক বুড়োমতন ভদ্রলোক। দূরের সীটে উল্টোদিকে মুখ করে বসে। সচিত্র বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা খুলে মগ্ন। এটা ঠিক বেড়ানোর সীজন নয়। চেঞ্জারেরা সব ফিরে আসছে। রমেন অনেকদিন ধরে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। হঠাৎ ছুটি মিলে

গেল, তাই এই অসময়বিহার। রমেন গলার কাছের বোতামটা খুলে দিল। তারপর সোনা-রঙের কেসের মসৃণ পিঠে আলতো করে সিগারেট ঠুকতে শুরু করল। এমন সময় ঘন্টি বেজে উঠতে মুহূর্তে সব কোলাহল নিভে গেল। একটু পরেই হুইসল দিয়ে ট্রেন নড়েচড়ে উঠল। রমেন তখন বুক শূন্য করে ধোঁয়া ছাড়ছে। দু'পাশের মন্থর ছবিগুলি ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে। ট্রেন প্ল্যাটফর্মের বাইরের আলোয় এসে পড়তে গোপা রমেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে চাপা ধমকের সুরে বলল, এই, হাঁ করে অসভ্যের মত কি দেখছ!

রমেন লক্ষ করল, ওর গোলাপী রঙের মুখখানা খুশিতে টলটল করছে। সে চড়া গলায় জবাব দিল, বারে! নিজের বিয়ে কয়া বউকে দেখব না তো কি—আব্দার!

গোপা চোখ মটকে দূরের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বোঝাতে চাইছিল। রমেন মাস্তানের মত ঠোঁট উল্টে বলে উঠল, বয়েই গেছে—

গোপা কপট রাগে জানালার দিকে মাথা সরিয়ে নিতে গিয়ে ঘোমটা গেল খসে। ওর বেলকুঁড়ি দুলটা ঈষৎ নড়ে উঠল। নরম চিবুক ভাঙা বিকেলের রোদ গড়িয়ে পড়ে চিক্‌চিক্ করে উঠল। বিয়ে হয়েছে সেই কবে। বৈশাখের শুরুতে। ছ'সাত মাস হয়ে গেল। এতদিনে দুজনে বেরুতে পারল। খবরটা শুনে অফিসের সাবরডিনেটরা আড়ালে বলাবলি করেছে, ছোটসাহেব হনিমুনে চললেন। বাবা গররাজি ছিলেন। ছেলের ওপর তাঁর বিশ্বাস কম। তাঁর আশঙ্কা একটাই, শেষটায় বউকে ফেলে রেখেই না ফিরে আসে রমেন। বড়দা অবশ্য হাঁ-হুঁ কিছু করেনি। বড়বউদি হেসে বলেছে, বুঝিনে ঠাকুরপো, আজকালকার হালচাল। একদিন আমাদেরও তো বিয়ে হয়েছিল। ঝুনু, বড়দার মেয়ে, বায়না ধরেছিল সঙ্গে যাবে। ভাগ্যিস সামনে ওর পরীক্ষা, তাই ছাড় পাওয়া গেছে। একমাত্র যা গরজ ছিল মার। এইজন্যেই তো কবি বলেছেন, তুমিই ধন্য, ধন্য হে। মা বলেছে, ওদের দুজনের একটু

রিবিলি হওয়া দরকার। কলকাতায় তার সুযোগ কই। গোপা
কন্ত আগাগোড়া ভাবলেশহীন ছিল। এখন দেখে মনে হচ্ছে, তলে-
লে ও-ও খুব খুশী।

াড়ি গতি নিচ্ছে। এক একটা দৃশ্য গড়ে উঠতে না উঠতে মিলিয়ে
াচ্ছে। বড়বাড়ির মাথায় ওষুধের বিজ্ঞাপন চিমনির ধোঁয়া চোঙ-
খালার বস্তি লেভেল ক্রসিং। রমেন হাত বাড়িয়ে দগ্ধশেষ সিগারেটের
করোটা বাইরে ছুঁড়ে দিল। তারপর ঘড়ির ব্যাণ্ড আলগা করতে করতে
লল, কি ভাবছ?

মেনের কথায় চমক ভেঙে নড়েচড়ে উঠে গোপা বলল, কিছু না।
মনি—

াড়ির কথা মনে পড়েছ বুঝি? এ ক'মাসে দিব্যি লক্ষ্মীবউটি বনে
ায়ে যা পপুলারিটি তোমার,—বলতে বলতে রমেন রুমাল দিয়ে মুখ
ছতে শুরু করল। বাইরে হেমন্তের আকাশ। ঘরবাড়ি পুকুর
াগান ভেদ করে গাড়ি ছুটছে। গোপা ছোট করে নিশ্বাস ছাড়ল।
শুরবাড়ির কথা মনে পড়তে গায়ে জ্বর এল। সকাল থেকে গভীর
াত অবদি কেবল কাজের জাল বুনে যাওয়া। প্রতিদিন একই নিয়মে।
খন বিকেল ক'টা? চারটা হবে। সুইনহো স্ট্রীটের ফ্ল্যাট বাড়িতে
তক্ষণে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। দুপুরের খাওয়া শেষ করে পা-মুড়ে
'দণ্ড বসবার পর্যন্ত ফুরসুৎ মেলেনি। মলি এলেন কলেজ থেকে।
র জলখাবারের বন্দোবস্ত চাই। সুখাদ্য না হলে ধিঙ্গি মেয়ে নাকিসুরে
ান্না জুড়ে বসবে। বড়দির চলাফেরা বারণ। আট ন'বছরবাদে
ছলেপুলে হতে চলেছে। মা নড়তে-চড়তে পারেন না। দু'চোখে ঘসা
াচের ঠুলি। আর একটু শীত পড়লেই ছানি কাটাবেন। ওদিকে
ভোলাকে দিয়ে শ্বশুরমশায় ঘন ঘন তলব পাঠাচ্ছেন। দ্বিপ্রহরিক
িদ্রান্তে হাতমুখ ধুয়ে অনেকক্ষণ হল অপেক্ষা করছেন। ঝুলবারান্দায়
ডকচেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে আছেন। বিকেলে ওঁর সুজির পায়েস
বাদ্দ। বাটি নিয়ে ছুটতে হবে দোতলায়। পায়েসের বাটিটা হাতে

তুলে দিতেই দাঁড়াতে বলবেন। তারপর কিছুক্ষণ চলবে বাক্যবর্ষণ। সংসার বিষয়ে উপদেশ-দান। ওঁর সারা দেহে তখন অতিরিক্ত বিশ্রাম-জনিত আলস্য। বকে বকে ঝরঝরে হবেন। ওদিকে রান্নাঘরে উনুনে গরম দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছে। দিনকতক হল ফ্রিজটা চলছে না। ঠিকে-ঝি কামাই করছে। ধোপা এসে সদরদরজায় বসে আছে। এমন-সময় নিচ থেকে খোকা হাঁক পাড়ল। ওর ক্লাবে যাবার সময় হয়েছে। বাবু চা চাইছেন।

বাইরের দৃশ্যে চোখ পড়তে অবাক হল গোপা। শহরের শেষ চিহ্নটুকু কখন মুছে গেছে। গাড়ি এখন প্রান্তরের মাঝখানে। বড় করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে গোপা বুকের ভার হাল্কা করতে চাইল।

নতুন বাড়িতে এসে গোপা খুব খুশী। ঠিক যেমনটা চেয়েছিল। স্টেশন থেকে খানিক দূরে। কাছাকাছি লোকালয় নেই। বাড়িটা রমেনের অফিসের এক মালিকের। মাঝেমধ্যে তিনি সপরিবারে বেড়াতে আসেন। ফলে ছোটখাট সংসার পাতাবার মত জিনিসপত্র সবই আছে। বাড়িটা দেখাশুনা করার জন্য একজন লোক আছে। নাম কাদ্রু। জাতে মাহাতো। দশাসই চেহারা। ছোট বাড়ি, একটা টিলার ওপরে, বাংলোধরনের। দুটো ঘর। একটা বেশ বড়। ছোট ঘরটা ড্রইংরুম হিসেবে চমৎকার। ঘরের চারদিক ঘিরে বারান্দা। পিছনের বারান্দায় এক কোণা থেকে প্যাসেজমত খানিকটা চলে গিয়েছে রান্নাঘর বাথরুমের দিকে। প্যাসেজের পাশেই মস্ত চৌকানা উঠোন। উঠোনের শেষে একসার আতাগাছ। বাড়ির সীমানা ঘিরে কিছু ইউক্যালিপটাস আর ঘোড়ানিম দাঁড়িয়ে।

সামনের বারান্দায় দাঁড়ালে ভারি সুন্দর একটা ছবি ফুটে ওঠে। বাড়ির সীমানা ছাড়ালেই উঁচুনিচু জমির সার। স্থানীয় লোকেরা জমিকে বলে ডাহি। ডাহির শেষে দূরে শালবনের নিবিড় জড়াজড়ি। তার পিছনে আদিগন্ত পাহাড়। হঠাৎ চোখে পড়লে মেঘমালা বলে ভ্রম হবে।

## সীমানা ছাড়িয়ে

দুপুরবেলা অনেকক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থাকলে উজ্জ্বল রেশমী রৌদ্রে মনে হয়, পাহাড়গুলো একটু একটু করে এগিয়ে আসছে।

দু'টোদিন যেতে না যেতে সব কিছু নিখুঁত করে সাজাল গোপা। একটু নড়চড় হবার জো নেই। উঠতে বসতে রমেন এখন গোপার নিয়মের অধীনে। আলনা-হ্যাংগারে জামাকাপড় ঠিক ঠিকমত সাজানো। ছোট-ঘরের দেয়াল-আলমারিতে রাইটিং প্যাড বই কালিকলম রয়েছে। বেতের চেয়ারদুটো মুখোমুখি বসানো, অবসরসময়ে গল্প করার জন্য। ড্রেসিং-টেবিলটা বড়ঘরে এমন জায়গায় আছে যাতে বারান্দার সিঁড়িতে পা রাখলেই চোখে পড়ে যায়। বাথরুমের দেয়ালে হোয়াটনটে পেস্ট টুথব্রাশ তেল সাবান সাজিয়ে রাখা হয়েছে। শোবার ঘরের কাচের শার্সিআঁটা জানালায় পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধি করে দুটো পেতলের ভাস নিয়ে আসা হয়েছিল। ও দুটো শিয়রের কাছের টেবিলে রাখা হয়েছে। সকালবেলা বাজারফেরতা কাদ্রু কোত্থেকে চমৎকার কিছু ফুল নিয়ে আসে। পাহাড়ী মল্লিকা মুচকুন্দ হিমঝুরির ডাটি। সারারাত মিষ্টিগন্ধ ছড়ায়। গোপার শুধু একটাই আফসোস, তানপুরাটা আনা হল না। কত করে মলি বলেছিল। শুক্লপক্ষের শুরুতে ওরা এসেছে। সকাল সকাল জ্যোৎস্না ওঠে। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে গলা ছেড়ে গান গাওয়া যেত। একদিন মাঝরাতে ওদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কাচের সার্শি গলে ঘরে একরাশ জ্যোৎস্না ঢুকে পড়েছিল। ওরা দুজন আর ঘুমোতে পারেনি। দরজা খুলে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাত ধরাধরি করে অনেকক্ষণ পায়চারি করেছিল। ওদের কারুর মুখে কথা ছিল না। দূরে সাঁওতালপল্লীতে মাদল বাজছিল। ডাহি থেকে তিতির কেঁদে কেঁদে উঠছিল।

শেষরাতে গোপার ঘুম ভাঙে। একটু বাদেই বাইরে সকাল ফুলের মত ফুটে উঠবে। ঘরের ভেতর তখনও আবছায়া। গোপা চোখ মেলতে দেখে, রমেনের বিশাল লোমশ বুকের মধ্যে ওর মুখ ঢাকা পড়ে আছে।

## বিষয় দাম্পত্য

সারারাত তাপ দিয়ে দিয়ে রমেন এখন শান্ত, নিদ্রামগ্ন। গোপা জানে, এখন ওকে জাগিয়ে তুললে অনর্থ ঘটবে। শেষরাতের দিকে ওর ঘুম গাঢ় হয়। ডেকে তুললে শিশুর মত হাত-পা ছুঁড়ে অস্ফুট চেঁচাবে।
খুব আস্তে খাট থেকে নেমে দরজা খুলে পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় গোপা। থামে পিঠ রেখে অর্থহীন তাকিয়ে থাকে। আকাশে তখনও গুটিকয় তারা, বাদামী রঙের আলো ছিটোচ্ছে। একটু একটু করে চারিদিক ফর্সা হতে থাকে। আতাগাছের সার ঘাসঝোপ ঘোড়ানিমের জাফারি স্পষ্টতর হয়ে উঠে। এমন সময় গেটের সামনে গরুর গাড়ির চাকার বিশ্রী আওয়াজে গোপার ঘোর কাটে। এদেশে জলের বড়ই অভাব। দূরগ্রামের ইঁদারা থেকে একটা লোক জল দিয়ে যায়। কয়েক ড্রাম জল। সারাদিনের স্নান-রান্নার মত। গোপা কয়েকটা হাই তুলে আলস্য তাড়ায়। তারপর ঘর থেকে দরকারমত শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে বাথরুম চলে যায়।
নিরিবিলিতে এসে গোপার শুচিতা যেন বেড়ে গেছে। ইঁদারার হালকা টলটলে জল। সুগন্ধি সাবান ঘসে শরীরটা ঝরঝরে করে নেয়। সকালের দিকে বেশ শীত। তবু স্নান করে নিলে সারাটাদিন চমৎকার কাটে। রমেন বলে, আচ্ছা এখানে এসে তোমাকে ভাল লাগছে কেন বলো তো? গোপা উত্তর করে না। শুধু টসটসে দু' ঠোঁটের পাতা ভেঙে হাসে। ওদিকে কাদ্রু উঠোনে দাঁড়িয়ে। হাতে থলিভর্তি বাজার। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। উজ্জ্বল রৌদ্র চারদিক ঝকঝম করছে। বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে গোপা দু-চারটে বৈষয়িক কথাবার্তা বলে। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে কাদ্রুর ছুটি, চলে যায় ডাহিতে। ধানকাটা শুরু হয়ে গেছে।
এরপর কাজ শুরু হল। প্রথমেই স্টোভ ধরানো। গোপা প্রতিদিন অভিনব একটা কিছু করে রমেনকে অবাক করে দেয়। গাজরের হালুয়া কড়াইশুঁটির সিঙাড়া শালগম-লেটুস-টম্যাটোর স্যালাড। ব্রেকফাস্টের বহর দেখে রমেন থ' বনে যায়। এ ছাড়া ডিমসেদ্ধ, গমম একবাটি

দুধ তো রয়েছেই।

সসপ্যানে জল ফোটে। ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটতে কাটতে বাইরের দিকে চোখ পড়ে গোপার। নিকোনা উঠোনে আতাগাছের ছায়াদের চঞ্চল মাতামাতি। আকাশটা কি ঝলমলে। কেউ যেন গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে চারধারে। সতেজ হাওয়া বইছে। ইউক্যালি-পটাসের শিরশিরানি শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণে হলুদ পাখিটা ঘোড়ানিমের পাতার আড়াল থেকে শূন্যে ঝাঁপ দিল, রৌদ্রের শুভ্র স্রোত কেটে চলেছে শালবনের দিকে। ধীরে ধীরে গোপার স্মৃতি ঝাপসা হতে থাকে। একটা ভাব পেয়ে বসে ওকে। অনেক করেও সুইনহো স্ট্রিটের কর্মচঞ্চল বাড়িটার ছবি মনে গড়ে তুলতে পারে না। দোতলার শোবার ঘর ডাইনিং টেবিল শ্বশুরঠাকুরের মুখ—, সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায়।

ওদিকে রমেনের ঘুম ভেঙে গেছে। হাত বাড়িয়ে দেখেছে গোপা নেই। অথচ আশ্চর্য, জেগে উঠবার আগে, অর্ধচেতনায়, তার কেবলই মনে হচ্ছিল, গোপা তার বুক জুড়ে উষ্ণতা দিচ্ছে। মাছের পাখনার মত চিকন পায়ের পাতা ঘসছে তার পায়ে। আর সেই মিষ্টিগন্ধটা রাতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। চীনে লণ্ঠনটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে কম্বলের ভেতর ঢুকবার আগে দুহাত দিয়ে মস্ত খোঁপাটা খুলে দিয়েছিল গোপা। অর্ধনিমীলিত চোখে রমেন দেখেছিল রাশি রাশি চুল ঝাঁপিয়ে পড়ছে অন্ধকারে। আর সেই নেশা ধরিয়ে দেওয়া গন্ধ। রমেন পাশ ফিরল। একটুবাদেই গোপা আসবে প্রভাতী চা নিয়ে। চোখ মেলতে ইচ্ছে করছে না। খানিকক্ষণের এই ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব রমেনকে মনোরম কিছু ভাববার সুযোগ দেবে।

পাথুরে মাটিতে পা দিয়েই গোপা যেন অন্য মানুষ। মাত্র সাত দিন হল ওরা এসেছে। এর ভেতরেই গোপাকে আর চেনা যাচ্ছে না, নতুন বলে মনে হচ্ছে। বাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। ওখানে সব সময় কাজের ভিড়ে। আড়ালে আবডালে। আর এখানে

এসে, এই আলো হাওয়া নির্জনতা জ্যোৎস্নায়; জমাটবাঁধা মেঘ ফিকে হয়ে যেন ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। ঘরময় সারাদিন ছুটোছুটি করছে। আতাগাছের ছায়াদের হিলিবিলি শুরু হল, ইউক্যালিপটাস তানপুরার মত বাজছে, মহুয়াগাছতলায় রাখাল ছেলেদের কলগুঞ্জন, দূরের পাহাড়ে রেশমী শূন্যতা কাঁপছে—এ সব কিছুর মধ্যে কার উপস্থিতি।

চায়ের কাপ নিয়ে গোপা আসছে। বারান্দায় পদশব্দ জেগে উঠতে রমেন সচকিত হল। সাতসকালে উঠে গোপার এতটা তৎপরতা অসহ্য লাগে। মোটে তো দুটি প্রাণী। রমেন সবেগে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরল। কম্বলটা গলা অব্দি টেনে নিয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল। গোপা ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে শিয়রের কাছের টেবিলে চায়ের কাপটা রাখল। ও মিটমিট হাসছিল। আশ্চর্য অলস হয়ে গেছে রমেন। সারাদিনরাত শুয়ে বসে কাটাচ্ছে। এ ক'দিনে একবারের জন্য ঘর থেকে নড়ানো গেল না। ধূর্ত বেড়ালের মত শুধু ওৎ পেতে আছে। গোপাকে কাছে পেলে কেবলই দৃশ্যের পর দৃশ্য নাটক জমিয়ে তুলছে।

এই—ই—ই—, বলে মিষ্টি করে ডাকতে গিয়ে গোপা খাটের কাছে এল। তারপর ঝুঁকে পিঠে ধাক্কা মারল। রমেন তখনো নিঃসাড়। এবার গোপা খাটের প্রান্তে বসে পড়ল। কম্বলের ভেতরে ঠাণ্ডা হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে গলায় সুড়সুড়ি কাটতে রমেন চকিতে পাশ ফিরল। অব্যর্থ ভঙ্গিতে গোপার কোমর জড়িয়ে ধরে আধো আধো গলায় বলে বলে উঠল, হু-উ-ম।

গোপা ওকে ঝাকুনি দিতে দিতে গলার স্বর চড়ালো, আচ্ছা মানুষ তো। কখন আটটা বেজে গেছে। ওঠো!—রমেন গোপার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে ওর ঠাণ্ডা হাতটা ধরে টানতে লাগল, প্লীজ, ভেতর এসো না, লক্ষ্মীটি। রমেন বিলক্ষণ জানে প্রতিদিনের মত আজও গোপা ওর আদর পাবার আশায় নাগালের ভেতর ধরা দেবে। আর এখন,

সবে বাথরুম থেকে এল, ওর ভেজা চুলে কি মিষ্টি গন্ধ সারা শরীরে কি মাদকতা।

গোপার ঠাণ্ডা হাতটা রমেনের লোমশ বুকে চলাফেরা করছে। গোপা বলল, না, আজ আর কোনো দুষ্টুমি নয়। ওঠো দেখি। ভাবছি আজ নদীটা দেখতে যাব।—রমেন ওর কোলে মাথা রাখল। বলল, আজ নয়। আর একদিন যাওয়া যাবে। শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। —কাদ্রুর মুখে গোপা শুনেছিল, শালবনের ওপাশে ছোট একটা নদী আছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে। শান্ত নির্জন জলধারা। গাছে কত-রকমের পাখিদের ভিড়। কথাটা শোনা অব্দি রমেনকে তাড়া দিচ্ছে গোপা। রমেন কেবলই এড়িয়ে যাচ্ছে। আজ গোপা নাছোড়বান্দা। ও সজোরে মাথা নেড়ে বলল, না, আজই যাব। আর ক'দিনই বা আছি। শেষে দেখাই হবে না—

রমেন এবার নড়েচড়ে উঠে বলল, তার মানে! আমরা এখনও তো বেশ কিছুদিন থাকব। কাল যে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম অফিসে—। গোপার জায়গাটা খুব ভাল লেগে গেছে। যৌথ পরিবার। বাইরে বেরুনোই এক সমস্যা। গোপা এসে থেকে পীড়াপীড়ি করছে। রমেন তাই আরো দিনপনেরর মত ছুটির কথা জানিয়ে অফিসে চিঠি দিয়েছে। গোপা রমেনের কোন কথার উত্তর না করে টেবিল থেকে কাপটা তুলে ওর হাতে দিল। রমেন কাপটা নিতে না নিতেই গোপা উঠে দাঁড়াল। দুপা পিছিয়ে গিয়ে হেসে ফেলল। বলল, ওসব কথা বুঝি না বাপু। আজই যাব। চটপট দাড়ি কামিয়ে স্নান করে নাও তো। অনেক দূরের পথ—। রমেন কিছু বলার আগেই ও বড় বড় পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ডাহির পথে নামতে বেশ বেলা হল। রৌদ্রের তাত মরে গিয়ে তখন চারিদিক নিঝুম হয়ে আসছে। প্রস্তাবটা ছিল গোপার। কার্যত দেখা গেল গরজটা রমেনেরই বেশী। বারোটার মধ্যে ও জামাকাপড়

পরে তৈরি। গোপার আর হয় না। সব ব্যাপারে ওর সতর্কতা সত্যাই পীড়াদায়ক। পাগলামি শুরু করে দিল। ওয়াটারবটল্, ফ্লাস্ক ভর্তি চা, তিনব্যাটারির টর্চ, টিফিনকেরিয়ারে শুকনো খাবার ডিমসেদ্ধ রুটি। এছাড়া চাদর লং কোট ভিকসের বড়ি ইত্যাদি তো আছেই। দেখে মনে হবে, ওরা বুঝি রীতিমত একটা অভিযানে বেরুচ্ছে। ডাহির মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথ গিয়েছে এঁকেবেঁকে। কোথাও এক একখণ্ড ধানজমি। দু'একটা মহুয়াগাছ চোখে পড়ে। উঁচুনিচু পথে ঠিকমত এগুনো যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ হাঁটতে এক সাঁওতাল পল্লীর কাছে এল ওরা। গোপা একটা ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ধান ঝাড়াই হচ্ছিল ওখানে। এক টিবির ওপর দেখা গেল এক বুড়ো বসে আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। পাখি ধরবার আশায় জাল বিছিয়ে রেখেছে। কোথাও ঝোপের আড়ালে রাখাল ছেলেদের জটলা। ওদের সাড়া পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে।

গোপা আগে আগে চলছিল। রমেন অনেক পিছনে। ওকেই যাবতীয় জিনিসপত্র বইতে হচ্ছে। এক একবার গোপা ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। আঁচল উড়িয়ে পশ্চাদ্‌বর্তী রমেনকে ইশারায় ডাকছিল। রমেন মনে মনে গজরাচ্ছে, দাঁড়াও, একবার শালবনের কাছে পৌঁছই, মজা দেখচ্ছি তোমার—। মাথার ওপরে হেমন্তের সংকেতহীন আকাশ, অকরুণ। যেন একটা প্রকাণ্ড গম্বুজের খোল। মুখ তুলে তাকালে মাথা ঘুরতে শুরু করে। সামনের দিকে চোখ মেললে সেই একই দৃশ্য। উঁচুনিচু পথে চলতে দূর শালবনের এক লুকোচুরি খেলা। আর ধূ ধূ ব্যঞ্জনা-বিহীন প্রান্তরে অবিরল মাঠপোকার ডাক। ক্ষীণ মন্থর। চেতনা ধূসর করে তোলে।

শালবনের কাছে পৌঁছোতে বেলা পড়ে এল। রৌদ্রে এত-ক্ষণ খানিক আভা ছিল। দেখতে দেখতে চারিধার মলিন হয়ে আসছে। দিনশেষের বাতাসে শালবন কাঁপছে। পাতাঝরার মত শীত পড়েনি এখনো। ফলে শালবনের নিচের দিকটা বেশ পরিষ্কার। লম্বা লম্বা

## সীমানা ছাড়িয়ে

গাছের অবকাশে ওপাশের অনেকটা দেখা যাচ্ছে। শালবনের পরেই খোয়াইমত বেশ খানিকটা জায়গা। তার প্রান্তে নদীর উঁচু পাড়। পিছনে বিস্তীর্ণ পাহাড়।

শালবনের ভেতরে ঢুকতেই বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে করে উঠল। অসংখ্য পাখির এলোমেলো চিৎকার। অতর্কিত আততায়ীর মত অকস্মাৎ চেতনাকে স্তব্ধ করে দিল। বনের ভেতরটা ছায়াছায়া। দিনের সঞ্চিত তাপটুকু জুড়িয়ে মাটি শীতল হয়ে আসছে। গাছের ডগায় রক্তিম আলো শেষবারের মত ছটফট করছে। গোপা অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওকে দেখা যাচ্ছিল না। রমেন চেঁচিয়ে ডাকল, গোপা, দাঁড়াও না। কোথায় গেলে—

গোপা ততক্ষণে খোয়াইতে নেমে পড়েছে। রুক্ষ খোয়াই। শুধু কাঁটা-গাছ আর ঘাসঝোপ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। উঁচু নিচু ভূখণ্ড। যেন স্তব্ধ ঊর্মিমালা। দেখে মনে হয়, বহু যুগ আগে দূর পাহাড়ের জলধারায় নিমগ্ন ছিল এই খোয়াই। চকিতে দিনের শেষ আলোটুকু নিভে যাচ্ছিল। অন্ধকারে থাবা বসাচ্ছে মাটিতে। চারিধার কি শব্দহীন। আর শব্দহীন বলেই সব কিছু অন্ধকারে দ্রুত বিমর্ষ হয়ে পড়ছে। এমন সময় শালবনের ভেতর থেকে আকুল ডাক শোনা গেল, রমেন ডাকছে। গোপা মুখ তুলে তাকাল সামনের দিকে। দেখল, নাতিদূরে নদীর উঁচু পাড় ঘেঁষে অকম্পিত বৃক্ষের সার, অন্ধকারে সমুদ্ধত। যেন এক প্রাচীন দুর্গপ্রাকারে সারিবদ্ধ প্রহরীর দল। বর্শা হাতে অচঞ্চল দাঁড়িয়ে, শত্রুর অপেক্ষায়। আর বৃক্ষরাজির ঠিক পিছনে, দুই পাহাড়ের খাঁজে ছ্যাপথলিনের মত বিবর্ণ এক চাঁদ, নিটোল। গোপা ঘুরে দাঁড়াতে চাইছিল।

একটু পরেই রমেন খোয়াইতে নেমে এল। ও গোপাকে দেখতে পেয়েছে। টর্চের আলো জেলে সতর্ক পায়ে রমেন গোপার কাছে এল। অন্ধকারে মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল, ও খুব অখুশী। গম্ভীর

গলায় বলল, একা একা চলে এলে! শেষে যদি তোমায় খুঁজে না পেতাম—।—গোপা ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। ওর শরীর স্পর্শ করল। কোন কথা বলল না। রমেনকে ধরে চলতে লাগল অন্ধের মত।

নদীর পাড়ে এসে ঝোলাঝুলি নামাল রমেন। বলল, সতরঞ্চিটা পাতো দেখি, বসি একটু আরাম করে। তারপর বিশ্রী একটা হাই তুলে হাত পায়ের গিঁঠ ছাড়াতে লাগল। পাহাড়ী নদী। একটা বড় গাছকে শুইয়ে দিলে পারাপার করা যায়। অনেকটা খাড়ি। নিচের জলধারা চোখে আসে না। ওপারে কিছুটা পরিত্যক্ত প্রান্তর। তারপর দিগন্ত-ব্যাপী উঁচুনিচু পাহাড়ের মৌন। বিবর্ণ চাঁদ এখন অনেকটা উঠে এসেছে। একটু একটু করে আলো ফুটছে। গোপা নিঃশব্দে সতরঞ্চি পাতল। তারপর মুখ তুলে তাকাতে দেখল, গাছের ফাঁক দিয়ে চেরা চেরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। কোথাও একটু বাতাস নেই, শাখাপ্রশাখার আন্দোলন নেই। এমনকি নিচের অন্ধকারে নিমগ্ন জলধারার ক্ষীণতম শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

রমেন জুতোশুদ্ধ সতরঞ্চির ওপর গা এলিয়ে দিল। অন্যসময় হলে গোপা প্রতিবাদ করত। এখন করল না। বরং ওর শরীর ছুঁয়ে বসল। রমেন একটা সিগারেট ধরাল। অন্ধকারে সিগারেটের আগুন জোনাকির মত জ্বলে জ্বলে উঠছে। বারকয়েক নির্বিকার ধোঁয়া ছেড়ে রমেন বলে উঠল, ফ্লাস্কটা খোলো দেখি, চা খাই। গলাটা শুকিয়ে গেছে। এতটা পথ হেঁটে আসবার সময় গোপাকে নিবিড় করে পাবার সংকল্প ভেতর জমাট বেঁধেছিল। কিন্তু, এখন পথশ্রমের পর রমেন ক্লান্ত। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে ওর হাতে তুলে দিতে দিতে গোপা নিচু স্বরে বলল, আর কিছু খাবে? রমেন মাথা নাড়ল, না এখন নয়। ভাল করে জ্যোৎস্না উঠুক, তারপর।

চাঁদটা ধীরে ধীরে রূপোলি হয়ে উঠছে। জ্যোৎস্নার সর পড়ছে আকাশে। গাছের অন্ধকার শামিয়ানার তলা থেকে রমেন চেঁচিয়ে উঠল, একটা গান ধরো দেখি, শুনি। মাটি থেকে ঠাণ্ডা ভাপ উঠছে। আলোছায়ায় মৌন পাহাড় ভয়ঙ্কর। গোপা বলল, না, গান-টান নয়।

একটুবাদেই উঠব। এতটা পথ ফিরে যেতে, বলতে বলতে ওর গলায় স্বর জড়িয়ে এল। ডাহির দীর্ঘপথের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে গোপা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। রমেন চেঁচিয়ে উঠল, তোমার আর কি! দিব্যি তো এলে ঝাড়া হাত-পায়ে। আর আমি, একগাদা মালপত্তর নিয়ে। ইম্‌পসিবল, এখন কিছুতেই যাওয়া হচ্ছে না।

রমেন অহেতুক চেঁচিয়ে কথা বলছে। গোপার অসহ্য বোধ হচ্ছিল। কেননা সেই শব্দমালা চারদিকের গভীর নীরবতায় বেসুরো লাগছিল। একসময় রমেন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। হাতের জলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে দিল জলের দিকে। নিঃশব্দে জুতোর ষ্ট্র্যাপ খুলল। গোপা হাত উঁচিয়ে তাড়াতাড়ি ওর পাঞ্জাবির এক অংশ ধরে ফেলল। দমবন্ধ করে বলল, একি! উঠলে কেন?—অন্ধকার শাখা-প্রশাখার নিচে টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট রমেনের মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। রমেন ততক্ষণে পাঞ্জাবির আস্তিন গুটোচ্ছে। গম্ভীর গলায় বলল, বসো একটু। নদীতে নামছি। এখ্‌খুনি ফিরে আসব।—গোপার কিছু বলার ছিল, কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ও শুধু ককিয়ে উঠল, ন্‌না।—রমেন হাঁটু ভেঙে নদীর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। এবার শরীরের ভারসাম্য রাখার জন্য হাতদুটো দুপায়ে ছড়িয়ে দিল। তারপর এক পা এক পা করে নামতে শুরু করল। গোপা জড়ানো গলায় ডাকল, যেয়ো না। লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো রমেন।—এই প্রথম গোপা ওর নাম ধরে ডাকছে। রমেনের পায়ের তলায় কুচি কুচি নুড়ি বিঁধছে। শাখাপ্রশাখার আবছায়ায় সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রমেনের একবার ঘুরে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছিল। ওর ধারনা, গোপা এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতদুটো বুকের মধ্যে জড়ো করে কাঁপছে। ভয় পেলে ওকে অদ্ভুত দেখায়। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে সাহস হল না। খাড়ি-পথ। মুহূর্তে পা হড়কে গড়িয়ে গভীরে নেমে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। ওপারের কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। পিছনে পাহাড়, অন্ধকারে নিবিড় হয়ে আছে। মাঝখানে শূন্যতার ব্যবধান। নিচে কোথাও নদী,

শব্দহীন। শুধু অনির্দেশ পথ হাঁটা।

এভাবে কিছুটা নেমে আসার পর ভিজে ভিজে শীতলতার স্পর্শ পেতে রমেন বুঝল, সে জলধারার কাছাকাছি চলে এসেছে। আরো দুপা এগুতে জলের হদিশ মিলল। এতক্ষণে ছায়ার শাসনের বাইরে আসা গেল। এখন চন্দ্রালোকে তটভূমি স্পষ্ট। রূপোলি জলধারা চকচক করছে। রমেন অবাক চোখে দেখল এক শান্ত ঘুমন্ত নদীকে। ওর তর সইছে না। পা চালিয়ে নেমে এল জলের কাছে। তাড়াতাড়ি একটা পা ডুবিয়ে দিল জলের ভেতরে। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরকার শূন্যতা ভীষণভাবে স্পন্দিত হয়ে উঠল। সাদা চোখে তাকালে নদী শান্ত, নিস্তরঙ্গ। অথচ তলে তলে কি তীব্র স্রোত। জলের টানে ঠিকমত পা রাখা যাচ্ছে না। আর কি ঠাণ্ডা, বরফের কুঁচির মত বিঁধছে। বিবর্ণ চাঁদটা মাথায় ওপরে উঠে এসেছে। রমেন ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকাল। মরা জ্যোৎস্নায় জড়ানো আঁকাবাঁকা একফালি আকাশ, অনেক উঁচুতে। চাঁদটা এখন উজ্জ্বল। মস্ত রূপোর থালার মত। ওপার থেকে একটা পাহাড়ের মুণ্ডু অতিকায় জিরাফের মত লম্বা গলা বাড়িয়েছে চাঁদটার দিকে। যেন গিলে ফেলতে চাইছে চাঁদটাকে। আর ভয়ার্ত চাঁদ খুব আস্তে আস্তে নেমে আসছে। লুকোতে চাইছে নদীজলে। রমেন ডাইনে তাকাল। অন্ধকার গাছের নিবিড়তায় গোপাকে দেখা যাচ্ছে না। নামবার সময় টের পায়নি। এখন এই তীব্র শীতল নদীজলে পা ডুবিয়ে রমেন বুঝতে পারছে, সে নিজের অগোচরে, নিতান্ত খেলাচ্ছলে, পৃথিবীর প্রান্ত থেকে কতটা গভীরে নেমে এসেছে। জলের ভেতরকার পা-টা ধীরে ধীরে নুড়ি-পাঁকের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে। শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। রমেন বুঝল, এইভাবে আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তার চোখের সামনে দিয়ে ভয়ার্ত চাঁদ পাহাড়ের মুণ্ড বৃক্ষের সার—সবকিছু একটু একটু করে ক্ষয়ে যাবে। আর সে একসময় জলের নিচেকার আলোড়নের ভেতর শীতলতার ভেতর ডুবে যাবে।

এমন সময় দূর বৃক্ষরাজির অন্ধকার থেকে গোপা 'র-মে-ন' বলে আর্ত চেঁচিয়ে উঠল। সেই চিৎকার বুকের ভেতর বিঁধে যেতে রমেন সচকিত হল। তীব্র হিম জলধারার মধ্যে নিমজ্জমান রমেনের কাছে ওই মানুষী শব্দোচ্চারণই একমাত্র অবলম্বন। এবং সেই শব্দের টানে সমস্ত নিম্নগ আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে ওঠে এল তটভূমিতে। তারপর, বন্যজন্তুর মত চার হাত পায়ে ভর করে অতটা খাড়িপথ ভেঙে ভেঙে রমেন ঠিক এসে পৌঁছুল বৃক্ষের অন্ধকার শামিয়ানার কাছে। গাছের নিচে এসে দেখল, দুহাত বুকের মধ্যে জড়ো করে গোপা থরথরিয়ে কাঁপছে। রমেন এগিয়ে এসে ওর শরীর ছুঁয়ে ডাকল, গোপা—। কিছু বলবার আগেই গোপা এলিয়ে পড়ল ওর বুকে।
একটু পরেই রমেন নিঃশব্দে সতরঞ্চি ফ্লাস্ক লংকোট—সবকিছু গুছিয়ে নিল। তারপর ওরা দুজনে ধীরে ধীরে নদীতীর থেকে খোয়াই শালবন বিস্তীর্ণ ডাহি অতিক্রম করল। এতটা পথ, ওরা সুখ-দুঃখ চেতনার অতীত এক রহস্যময় বোধে ভর করে, যেন দুঃস্বপ্নের ভেতব হেঁটে হেঁটে, অনেক ঘুরে গভীর রাতে ঠিক সেই টিলার ওপরকার বাংলো-বাড়িতে এসে পেঁাছুল।

পরের দিন সকালে, ঘুম ভাঙতে পাশ ফিরে গোপা দেখল, রমেন নেই। আলোয় ঘর ভেসে যাচ্ছে। বেলা আটটার কম হবে না। গোপার উঠতে ইচ্ছা করছিল না। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে অবসাদ জড়িয়ে আছে। তবু উঠতে হল। বিছানা থেকে উঠে টলতে টলতে পিছনের বারান্দায় এসে দেখল, রমেন ইউক্যালিপটাস গাছতলায় দাঁড়িয়ে। রৌদ্রের দিকে পিঠ রেখে সিগারেট টানছে। একবার ইচ্ছা হল ওকে ডাকবে। কিন্তু ডাকল না। বাথরুমে চলে এল। কাল রাতে ফিরে আসার পর ওরা উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে পড়েছিল। ও যে কখন পাশ থেকে উঠে চলে গেছে, গোপা টেরও পায়নি। এমনও হতে পারে, ওর ঘুম আসেনি। খানিক বিছানায় শুয়ে থেকে একসময় উঠে পড়েছে। দরজা খুলে বাইরে এসেছে। সারারাত বারান্দায় পায়চারি করেছে।

চোখে জল দিতে জ্বালা করতে শুরু করল। শীত শীত করছে। অন্যান্য দিনের মত প্রভাতী স্নানের কোনো প্রেরণাই পেল না গোপা। তবু, অভ্যাসবশত গায়ে জল ঢালতে শুরু করল। এক একবার আয়নার দিকে চোখ পড়তে থেমে যচ্ছে গোপা। চোখের কোণে কালি পড়েছে। মুখভর্তি বুটি বুটি হলুদের ছোপ, যেন গতরাতের জ্যোৎস্নাব আঁশ জড়িয়ে আছে। গোপা তাড়াতাড়ি সাবান তুলে নিয়ে মুখে ঘষতে লাগল। এমন সময় উঠোন থেকে রমেন বিশ্রী চেঁচিয়ে ডাকল, গোপা, এই গোপা। একবার বাইরে এসো তো, শিগ্‌গীরই—

রমেনের অতর্কিত চিৎকারে বিরক্ত গোপা সাবান মুখেই দরজা খুলে বাইরে এল। ওর সারা কাপড়ে জল। ব্লাউজটা ভিজে জবজব করছে। কপাল থেকে বুকের অনেকটা পর্যন্ত চুল এলোমেলো লেপ্টে আছে। গোপা তাকিয়ে দেখল, রমেন উঠোনের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ওর পিছনে একটু দূরে কাক্রু। রমেনের দুহাতে মুরগি ঝুলছে। মুরগি দুটোর গলার কাছে গভীর ক্ষত। সেই ক্ষত চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে নিকোনো উঠোনে। টাটকা রক্ত, গাঢ় লাল। কিছুক্ষণ আগে আতাগাছের পিছনকার ঘাস-জঙ্গলে মুরগি দুটো কাটা হয়েছে। এখনও ওরা প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে। গোপা ধমকের সুরে বলল, তুমি কাটলে? আশ্চর্য! কেন, কাক্রুকে দিলে হত না!—রমেন দু'পাটি দাঁত বের করে বিস্রস্ত গোপার দিকে তাকিয়ে শরীর কাঁপিয়ে বিশ্রী হাসতে শুরু করল। গোপা তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করল। তখনও রমেনের অট্টহাসি থামেনি।

রান্না শেষ করে খেতে বসতে বেলা আড়াইটা বেজে গেল। টাটকা মুরগি। অনেকক্ষণ ধরে সেদ্ধ করেও বুনো গন্ধ ছাড়ানো গেল না। অজ জায়গা ভিনিগার জাফরানের কথা এখানে ভাবাও যায় না। আতাগাছের ছায়ায় পাশাপাশি বসে খাবার প্রস্তাবটা ছিল রমেনের। কাক্রু ভাল করে উঠোন ধুইয়ে দিয়েছিল। থালায় ভাত-মাংস ঢেলে দেবার পর রমেন বায়না ধরল, নিজের হাতে করে গোপা ওকে খাইয়ে দেবে। এতে গোপার ভীষণ আপত্তি। কাক্রু বারান্দায় বসে। ও কি ভাববে। রমেন গম্ভীর হয়ে গেল, কোন কথা বলল

না। মাথা নিচু করে চটপট খাওয়া শেষ করল। শুধু উঠে যাবার সময় বলল, লজ্জাটজ্জা বাজে কথা। আসলে আমার কোন কিছুই তোমার ভাল লাগছে না। সে কথাটা স্পষ্ট বললেই তো পারো—। তারপর হনহন করে বাথরুমের দিকে চলে গেল। গোপা কিছু বলার সুযোগ পেল না। ওর গলায় তখন ভাত আটকে গেছে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল! ওদিকে কাদ্রু চীনে লণ্ঠনদুটো ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করে জ্বালিয়ে দু'ঘরে টাঙিয়ে দিয়ে এসেছে। চায়ের কাপ নিয়ে ছোটঘরে ঢুকতে গোপা দেখল, বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে রমেন বাইরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে। চায়ের কাপটা হাতে তুলে দেবার সময় ও কোন কথা বলল না। গোপা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন ডাকল, শোনো—। —গোপা ঘুরে দাঁড়াল। থমথমে গলায় রমেন বলল, আজ রাতে কিছু খাব না কিন্তু। খিদে নেই—।—গোপা বলল, সে কি, অনেকটা মাংস রয়েছে যে! তাছাড়া ভাত রাঁধলুম—। —রমেন বলল, কাদ্রুকে দিয়ে দাও। ওর ছেলেপুলেরা পেলে খুশি হবে। —গোপা এ কথার কোন জবাব দিল না। কেননা, ও জানে, কিছু বলতে গেলেই অনর্থ ঘটে যাবে। বিশেষ করে রমেনের বিশ্রী চেঁচিয়ে কথা বলায় গোপার ভয়। এরপর কয়েক ঘণ্টা, যতক্ষণ না ভাল করে জ্যোৎস্না উঠল, মস্ত রূপোর থালার মত চাঁদটা মাথার ওপরে চলে এল, ইউক্যালিপটাসের শিরশিরানি থামল, ততক্ষণ গোপা ঘর বারান্দা উঠোনময় উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে লাগল। শোবার ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে বিছানা পাতল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে চুল বাঁধল, ফ্লাওয়ার ভাসের জল পাল্টালো, পাপোশটা একবার ঘরের ভেতর ফের বাইরে রাখল। কাদ্রুকে পোঁটলায় করে ভাত মাংস দিয়ে ফিরে আসতে দেখল, রমেন বড় ঘরে চলে গেছে। গোপা এবার ছোটঘরে তালা লাগিয়ে পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল! গোপা খানিকটা সময় কাটাতে চাইছিল, যাতে রমেন ঘুমিয়ে পড়ে।

একসময় পা টিপে টিপে বড় ঘরে ঢুকতে গোপা দেখল চীনে লণ্ঠনটা

নেভানো। জানালার পর্দা তোলা। ঘরের কিছু অংশ জুড়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে। খাটের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল রমেন ঘুমোয়নি। দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে মাত্র। মাঝে মাঝে সিগারেটের আগুন জ্বলছে। গোপা দরজায় খিল দিয়ে জানালার কাছে এল। পর্দা নামিয়ে দিতে ওদিক থেকে রমেন বলে উঠল, পর্দাটা ফেলছ কেন! বেশ তো আ'লো আসছে। —গোপা বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল; কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। কি বিশ্রী জ্যোৎস্না!—রমেন কোন জবাব দিল না। সিগারেটের শেষাংশ দেয়ালে ঘষে নিভিয়ে দিয়ে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল। গোপা কম্বলের ভেতর ঢুকে পড়েছে। রমেন নিঃসাড়। গোপা এপাশ থেকে ফিস-ফিসিয়ে উঠল, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?—রমেন উত্তর করল না। ভাবল, ঘুমোতে পারলে সে বেঁচে যেত। গোপা এবার ওর চওড়া পিঠে হাত রাখল। আঙুলের নখ দিয়ে আঁক কাটতে কাটতে বলল, একটা কথা বলব?—ওদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। গোপা নড়েচড়ে রমেনের কাছে চলে এল। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, আমি বলছিলাম কি, চল ফিরে যাই। আর ভাল লাগছে না এখানে—। রমেন এবার ওপাশ থেকে স্পষ্ট বলল, সে কি! তুমিই তো বললে ছুটি বাড়িয়ে নিতে। আর এখন—। গোপা ওর পিঠে মুখ লুকিয়ে বলে উঠল, কতদিন হল এসেছি। আর ভাল লাগছে না। বাবার জন্যে মন কেমন করছে। মার ছানি কাটাবার সময় হয়ে এল! বড়দির শরীর ভাল নেই। ঝুনুকে দেখি না কতদিন—! —গোপার কথা শেষ হবার আগেই পাশ ফিরে রমেন ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলল, আমারও তাই ইচ্ছে—

তারপর আর কোন কথা হল না। ওরা ক্রমশ নিবিড়তর হয়ে একাকার হতে চাইল। ওরা পরস্পরের বুকের ওম্ পেতে চাইল। আর তখন বাইরে মস্ত চাঁদটা একটু একটু শব্দ করে যেন ভেঙে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় রঙ লাগছে। ইউক্যালিপটাস আর ঘোড়ানিমের পাতায় আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। আতাগাছের পিছনকার ঘাসজঙ্গল থেকে মুরগির পালক-গুলো হাওয়ায় উড়ে উড়ে আসছে। একটা দারুণ ঝড়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে পৃথিবী।

## আশ্রয়

কুট্-কুট্ কুটুর-কুট্……। একটা বিদ্ঘুটে আওয়াজে হঠাৎ রিনির ঘুমটা টকে গেল। প্রথমে খাটের তলায়। তারপর ড্রেসিং টেবিলের দিকে, আলনার কাছে, ওয়ার্ডরোবের ধারে—যেন নিশ্বাসের তালে তালে ছুটে বেড়াচ্ছে।

ভয়ে ভয়ে চোখ মেলল রিনি। সৈকত দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে নিঃসাড় পড়ে আছে। ঘরের ভেতর পাতলা অন্ধকার। শুধু মশারির এক জায়গায় এক পরত বাসি জ্যোৎস্না লেপ্টে আছে। কাঁপছে ফ্যানের হাওয়ায়।

খাটের পাশেই আলমারি। শব্দটা সেদিকে এগিয়ে আসতে রিনি তাড়াতাড়ি সৈকতের পিঠে একটা হাত রাখল। নাড়াল একবার। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় ক'রে উঠল সৈকত কিন্তু জাগল না।

খানিকবাদে। শব্দটা আচমকা আলমারির মাথা থেকে একলাফে ঝুপ করে এসে মশারির চালের ওপর পড়তে রিনি আর স্থির থাকতে পারল না। ফিসফিস করে ডাকল 'এই শুনছ—'

'কি হল?'—পাশ ফিরল সৈকত। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের খাঁজে মুখটা নামিয়ে দিল রিনি। দমচাপা গলায় বলল, 'শব্দ—'

'কিসের শব্দ?'

'বোধহয় ইঁদুর।'

'কোথায়?'—নড়েচড়ে উঠল সৈকত।

'আঃ, চেঁচাচ্ছ কেন', বিরক্ত হল রিনি, 'মশারির চালে—'
উঠে বসল সৈকত। হাতড়ে বেডস্যুইচ জ্বালল। ঘুমচোখে ওপরের দিকে তাকাল। মশারিটা ঝাঁকাল একবার। বলল 'কই, কিছু নেই তো—'
রিনি উত্তর করল না। আরো জড়সড় হয়ে রইল।
পাজামার দড়িতে গিঁঠ দিতে দিতে মশারির বাইরে বেরিয়ে গেল সৈকত। পায়ের গোড়ালি উঁচিয়ে ফের চালটা দেখল। শিয়রের দিকের জানালাটা বন্ধ করল। দরজার ল্যাচকি টেনে পরীক্ষা করল। শেষে ভেতরে ঢুকে আলো নিভিয়ে রিনিকে কাছে টেনে নিয়ে হাই তুলতে তুলতে বলল, 'হতে পারে। একতলা বাড়ি। পাশেই কাঁচা নর্দমা। কাল দেখা যাবে—'
একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল সৈকত। সুখে বিবশ তাপশূন্য শরীর। ওর রোমশ বুক থেকে ম্যাক্সফ্যাকটরের গন্ধ ফুটে বেরুচ্ছে। রিনির চোখে ঘুম নেই। বুকের ভেতর ঢিবঢিব করছে। এই মুহূর্তে ওর যত রাগ গিয়ে বর্তাল বাবার ওপর। এত তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দেবার কোন মানেই হয় না। মাসদেড়েক আগের কথা। মা-বাবার সঙ্গে রিনি গড়িয়াহাটে গিয়েছিল মার্কেটিং করতে। কেনাকাটা সেরে ফেরার পথে চায়ের দোকানে বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা। থাকেন জামির লেনে। বড় একটা প্রেসের মালিক। বাবার পুরানো বন্ধু। রিনিকে দেখে বলেছিল ঃ বাঃ সুবিনয়, তোর মেয়েটিকে দেখতে তো বেশ।—তারপর বাবার যা কাণ্ড। পাল্টা অনুরোধ করেছিল ঃ তোর তো কত চেনাজানা আছে। দে না একটা ভাল পাত্র জুটিয়ে।'—ঠিক তার তিনদিন পরের কথা। ছুটির বিকেলে সুরমাকে নিয়ে বিনয়বাবু তাদের ঢাকুরিয়ার শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোডের বাড়িতে এসে হাজির। সুরমা বিনয়বাবুর দূর সম্পর্কের দিদি। বাবার ধমক খেয়ে সাদামাটা পোশাকে কালোমুখ করে ওদের সামনে গিয়ে বসেছিল রিনি। দেখেই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল সুরমার। হবারই কথা। একমাথা কোঁকড়া চুল, লম্বা ছিপছিপে, গায়ের রঙ

আলতা-গোলা। দুধকচি সতেজ মুখশ্রী। তার কদিন বাদেই হাসিমুখে আনোয়ার শা রোড থেকে ফিরল বাবা। মা অবশ্য রিনির হয়ে এক-প্রস্থ লড়েছিল। বলেছিল ঃ দশপাঁচটা নয়, একমাত্র সন্তান। বিয়ের পর সেই কোন ধ্যাদ্ধেড়ে পাটনায় চলে যাবে! এ হতে পারে না। তুমি বরং ওদের না করে দাও।—বাবা বোঝাতে চেয়েছিল ঃ পেটে যখন মেয়ে ধরেছ, বিয়ে হলে তো একদিন না একদিন পর হয়ে যাবেই, তার আবার দূরে কাছে কি। খুব ভাল পাত্র। ব্রিটিশ ফার্মে কাজ করে। মাইনে দু'হাজার টাকার ওপর। তাছাড়া কোন দাবিদাওয়া নেই।—শেষ চেষ্টা করেছিল মা ঃ তাহলে ওদের আর একটা বছর অপেক্ষা করতে বলো। রিনি বি-এ ফাইনাল পরীক্ষাটা দিয়ে নিক।—বাবা মুখ গম্ভীর করেছিল ঃ তা আর হয় না শেফালি। আমি পাকা কথা দিয়ে এসেছি। বিয়ে এ মাসের সাতাশ তারিখে।—সেদিন অনেক রাত অব্দি রিনির ঘরে আলো জ্বলেছিল। বাবা রান্নাঘরে যেতে তার বুকপকেট থেকে সে চুপিচুপি সৈকতের ফটোটা হাতিয়ে নিয়েছিল। চ্যাপ্টা নাক, একজোড়া ছুঁচলো গোঁফ, ছোট কপাল, ড্যাবলা ড্যাবলা চোখ—দেখতে মোটেই ভাল নয়! তার ওপর চেনাজানা নেই, আলাপ পরিচয় হল না, আর এই মানুষটার সঙ্গেই কিনা হঠাৎ করে একদিন থেকে এক বিছানায় শুয়ে পড়বে হবে। ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠেছিল রিনি।

সকালে বাজার ফেরত সৈকত সঙ্গে করে নিয়ে এল একটা লোহার প্লেটে আঁটা মস্ত স্প্রিং-অলা ইঁদুরের কল। দেখে সুরমা শুধালেন, 'এটা কি আনলিরে ছোটখোকা?'

'কল, ইঁদুর মারব। ভাল হয় নি মা?'

'ইঁদুর, এ বাড়িতে! এ্যাদ্দিন আছি, কই, চোখে তো পড়েনি।'—কাবেরী কাছেই ছিল। হাসতে হাসতে সে বলল, 'এত বড় কল! এতে তো বেড়াল পড়বে ঠাকুরপো।'

'আর বোলো না, কাল সারারাত যা জ্বালিয়েছে—' আমতা আমতা করল সৈকত, 'মনে তো হচ্ছে ধেড়ে ইঁদুর। ছুঁচোটুচো হওয়াও বিচিত্র নয়।'

বেলা নটা বাজতে না বাজতে বাড়ি ফাঁকা। শৈবাল-কাবেরী একসঙ্গে বেরোয়। ওরা লেক গার্ডেনস-এ গিয়ে মিনিবাস ধরে। শৈবাল যায় ডালহৌসীতে। কাবেরী ব্যাঙ্কে কাজ করে, নামে হাজরায়। আজ সৈকতও দাদাবৌদির সঙ্গে বেরিয়েছে। ও যাবে হেড অফিসে। ট্রান্স-ফারের তদ্বিরে। পনের দিনের ছুটিতে এসেছে সৈকত। আর দিন চারেক বাদেই ওর পাটনা ফিরে যাবার কথা। বাসর রাতেই প্রসঙ্গটা তুলেছিল রিনি। সাফ বলেছে—কলকাতা ছেড়ে অতদূরে যেতে পারবে না সে। সৈকত অভয় দিয়েছে। অনেকদিন ধরেই সে চেষ্টা করছে। প্রবাসে সহায়হীন বছরের পর বছর পচে মরতে কার ভাল লাগে। মনে হচ্ছে—দুতিন মাসের মধ্যেই সে কলকাতায় ফিরে আসতে পারবে।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময়, আগের দিনের মতই চুমকি এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাকল, 'কাকিমা—'

ওর পরনে স্কুলড্রেস। হাতে এ্যালুমিনিয়ামের বাক্স। কাঁধে ওয়াটার বটল। পড়ে যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুলে, ক্লাশ টু'তে। এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রিনির ন্যাওটা হয়ে গেছে। বাড়ির বামুনঝিই ওকে দিয়ে নিয়ে আসে। কাল হঠাৎ চুমকি বায়না ধরল—সে কাকিমার সঙ্গে স্কুলে যাবে। বামুনঝি নিয়ে আসুক তাতে আপত্তি নেই। সেকথা শুনে সুরমা বলেছিলেন: ছিঃ চুমকি, কাকিমা নিয়ে যাবে কি! নতুনবৌ, তাছাড়া এদিককার পথঘাটও ভাল করে চেনে না।—সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্দী, একগলা ঘোমটা টেনে শুধু শোওয়াবসা, কি যে অস্বস্তি। হেসে বলেছিল রিনি: কি যে বলেন মা। আমি ঢাকুরিয়ার মেয়ে। এ অঞ্চলের সব জায়গাই আমার চেনা।—সুরমা আর আপত্তি করেন নি।

ক্লাশরুমের ভেতরে ঢুকে চুমকিকে সীটে বসিয়ে দিয়ে স্কুল গেটের বাইরে আসতেই রিনি ওদের দেখতে পেল। রাস্তার ওধারে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। যা আশঙ্কা করেছিল রিনি। গতকাল স্কুলে ঢোকার সময় সে রবীনকে দেখেছিল, পোস্ট-অফিসের সামনে। ইশারা করে ডেকেও ছিল

একবার। রিনি সাড়া দেয় নি। আজ পুরো দলটাই দাঁড়িয়ে। সুভাষ অমল দীপক আর রবীন।

রাস্তা পার হতে সকলের আগে এগিয়ে এল অমল। পরনে ষ্ট্রেচলনের বেলবটম প্যাণ্ট চক্‌কর্‌বক্‌কর্ একটা পুরু গেঞ্জি, ডানহাতে লোহার বালা। পেটানো স্বাস্থ্য। কলকাতার ফুটবল লীগে এ ডিভিশনে খেলে। বলল, 'কি, চিনতে পারছ ?'

'না চেনার কি আছে।'—রিনি সহজ হতে চাইল।

'না', হাতে হাতে ঘষল অমল, 'এখন তুমি তো পরস্ত্রী, তাই বলছিলাম আর কি—'

দীপকের চোখে সানগ্লাস, গায়ে ফেব্রিক প্রিণ্টের টি শার্ট, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট—অমলের কাঁধে হাত রেখে নাটুকে গলায় বলল, 'আই বাস্, কপালে কি বড় একটা সিঁদূরের টিপ ! সত্যি রিনি, তোমাকে যা ফাইন মানিয়েছে না—'

সঙ্গে সঙ্গে রবীন, বার চারেক হায়ার সেকেণ্ডারিতে ডাব্‌বা মেরে ভেরেণ্ডা ভাজছে, হিন্দী ফিল্মের পোকা, হাত পয়সা পড়লেই ম্যানড্রেকস চিবোয় —গাক গাক করে হেসে উঠল।

সুভাষ একটু বেপরোয়া টাইপের। চীনে বাজারে বনেদী কাগজের দোকানের মালিকের বখাটে ছেলে, কথাবার্তায় রাখঢাক নেই—গুরু পাঞ্জাবির হাতা গোটাতে গোটাতে বলল, 'যাই বলো রিনি এটা কিন্তু তুমি ভাল করলে না। শেষমেশ আমাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোথাকার কোন এক হরিদাসের সঙ্গে লটকে পড়লে !'

'তারওপর শ্ল্যা সুবিনয় চাটুজ্জে—' দীপক কনুই দিয়ে আস্তে করে পাঁজরায় একটা কোঁৎকা মারতে 'থুড়ি' বলে কথাটা ঘুরিয়ে দিল রবীন, 'মাইরি, আমাদের নেমতন্ন পর্যন্ত করলে না।

দেড়মাস আগে হলেও অমল সুভাষের সামনে দাঁড়িয়ে এরকম কথা বলতে সাহস হত না রবীনের। ফ্যাকাশে হাসল রিনি, 'এসব কথা আমাকে শুনিয়ে কি লাভ !'

'সত্যিই তো, ওকে বলছিস কেন বে,' কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ছড়াল সুভাষ, 'বাপমা যদি নেমতন্ন না করে তাহলে ও কি করবে—'

'তারপর বলো, কত্তাটি কেমন হল ?'—দীপক প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইল।

'ভালই।'

'না, সেকথা বলছি না', জিভের ডগা গালের একপাশে ঠেলে দিয়ে চোরা হাসল দীপক, 'মানে—ইয়েটিয়ে হয়েছে তো !'

রিনি মচকাল না। সাদা গলায় বলল, 'একদিন এসো না বাড়িতে। কাছেই তো। ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেব এখন—'

'এর মধ্যেই এ্যাদ্দুর গড়িয়েছে, অ্যাঁ।'—চাষাড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল অমল।

এরা পাড়ার ছেলে। সকলেয় সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। একমাত্র রবীন ছাড়া। ওকে কোনদিনই পাত্তা দেয়নি রিনি। এই তো, পার্টওয়ান পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার কয়েকদিন পরের কথা। অমলের সঙ্গে লুকিয়ে মেনকায় গিয়ে শোলে দেখেছিল। আর সুভাষের সঙ্গে তার মাখামাখির কথা পাড়ার কে না জানে। কতদিন কলেজ পালিয়ে ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। ওর পয়সায় রেস্টুরেণ্টের পর্দাআঁটা কেবিনে ঢুকে আণ্ডেপিণ্ডে গিলেছে। তারপর ট্যাক্সি চেপে সোজা চলে গেছে গড়ের মাঠে কিংবা লেকে। অন্ধকার গাছের নিচে হাত ধরাধরি করে বসে—। আর দীপক তো সরাসরি বাড়িতেই আসত। কথাবার্তায় তুখোড়। মাকে পটিয়ে ফেলেছিল। তাই অমলের কথার পর নিরুত্তর রইল রিনি।

সেদিন বাড়ি ফিরতে রাত করল সৈকত। এল দশটার পরে। কদিন ধরে গুমোট পড়েছে। এসে জামাকাপড় ছেড়েই বাথরুমে ঢুকল। সকালে উঠে কাবেরীর অফিসে ছুটতে হয়। সে সৈকতের জন্য আর অপেক্ষা না করে রিনিকে টেনে খাবার টেবিলে নিয়ে গেল। সুরমা অনেক আগেই শুয়ে পড়েছেন। মাছের বড় মুড়োটা রিনির পাতে

ফেলতে ফেলতে বলল কাবেরী, 'কেমন মেয়েমানুষ তুমি। গা থেকে এখনো বিয়ের গন্ধ শুকোল না, এর মধ্যেই ঠাকুরপোর উড়ু উড়ু ভাব—'

সৈকত ঘরে ঢুকে দেখল রিনি মশারির ভেতর। আংটায় এক টুকরো আপেল গেঁথে কলটা খুব সতর্কতার সঙ্গে খাটের তলায় পাতল। তারপর শুধোল, 'নর্দমার ফুটো বন্ধ করেছ?'

'হুঁ।'—দায়সারা জবাব দিল রিনি।

বিছানায় উঠে এসে বেডসুইচ অফ করে দিতে পাশ থেকে তীক্ষ্ণগলায় বলে উঠল রিনি, 'এত রাত অব্দি কোথায় ছিলে?'

আলিপুরে গিয়েছিলাম, বিচ্ছিরি জায়গা। ফেরার পথে বাস পাই না।'— রিনিকে কাছে টানতে চাইল সৈকত।

'হঠাৎ আলিপুরে কেন?'—সৈকতের আকর্ষণে উৎসাহ বোধ করল না রিনি।

'বড়সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম। খুব ভাল লোক। সব কথা খুলে বলতে সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার অর্ডার লিখে দিলেন।'

সুখবর। তবু রিনি নিরুত্তাপ রইল।

একটা হাত ওর কাঁধে তুলে দিয়ে ফের বলল সৈকত, 'পরশু সন্ধ্যার ট্রেনেই আমাকে পাটনা যেতে হচ্ছে—'

'হঠাৎ পরশু কেন?'

'বারে, ওখান থেকে রিলিজ সার্টিফিকেট আনতে হবে না! পয়লা তারিখ থেকেই এখানে জয়েন করতে হবে যে—'। রিনিকে আর কোন কথা বলার সুযোগ দিল না সৈকত। নিষ্পেষণে ওর ঠাণ্ডা শরীরটাকে জর্জরিত করে তুলল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বাদে জুড়িয়ে পড়লে সৈকত বলল, 'নাও এবার ঘুমোও। অনেক রাত হয়ে গেছে। আজ আর ভয় নেই। যা একখানা কল এনেছি—'

'ঠিক বলেছ', ঠোঁট বাঁকাল রিনি, 'নেংটি-ইঁদুর হলে কি আর ওই কলে ধরা পড়বে!'

পরিশ্রান্ত সৈকত উত্তর করল না। শিথিল দুহাতে রিনিকে জড়িয়ে

ধরে কিছুক্ষণের ভেতরেই অসাড় হয়ে পড়ল। রিনির চোখে ঘুম নেই আজো। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে পড়তে আবার সেই বিদঘুটে আওয়াজ ঃ কুট্-কুট্ কুটুর-কুট্। আজ শুধুই আলনার কাছে। দামি দামি শাড়ি রয়েছে ওখানে, এমনকি বিয়ের বেনারসীটাও। রিনির গলা শুকিয়ে কাঠ। ইচ্ছে থাকলেও সৈকতকে ডাকতে সাহস হল না।

পরদিন ভোরে দরজা খুলে বেরুতেই কাবেরীর মুখোমুখি পড়ে গেল রিনি। চোখ বড় করে হাসি গিলতে গিলতে বলল কাবেরী, 'একি চেহারার ছিরি! চোখের কোণে কালি, মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। ঠাকুরপো দেখছি ভারি দস্যি—'

ইচ্ছে করলে যে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে কাটান দিতে পারত রিনি। তবু সে ঠিক সময়েই চুমকিকে নিয়ে স্কুলের পথে বেরিয়ে পড়ল। ভয় তার অমলকে নিয়ে। যা বেপরোয়া ছেলে। শেষে খুঁজেপেতে হুট্ করে না এবাড়িতেই চলে আসে।

আজ এসেছে দীপক আর সুভাষ। ওরা দুজনে পুকুরপাড়ে জারুল গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল। রিনিকে হাত নেড়ে ডাকল। কাছে যেতে বলল, 'আজ দুপুরে তোমার কোন প্রোগ্রাম আছে?'

খেয়েদেয়ে বেলা বারোটার ভেতরেই সৈকত সীট রিজারভেশনের জন্য বেরিয়ে যাবে। রিনি মাথা নাড়ল, 'না।'

'তাহলে চলো রিনি', চোখ নাচাল দীপক, 'ম্যাটিনীতে নবীনায় যাই। দারুণ একটা ফাইটিং পিকচার এসেছে।'

'ধুস্ শালা, তোর মগজে কিস্যু নেই,' ধমকে উঠল সুভাষ, 'নবীনার কাছেই ওর শ্বশুরবাড়ি না! তার চেয়ে বরং চৌরঙ্গী পাড়ায় চল্—

'দি আইডিয়া!'—হাতের জ্বলন্ত সিগারেট জলের দিকে ছুঁড়ে দিল দীপক, 'তুমি আমাদের জব্বর ফাঁকি দিয়েছ রিনি। আজ যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে।'

'চাই কি শো ভাঙার পর চীনে হোটেলে ঢুকব।'—উসকে দিল সুভাষ। সৈকত এখনো কলকাতায়। মাথা নাড়ল রিনি, 'অসম্ভব, আজ আমি

বেরুতে পারব না'।

'বুঝেছি,' চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল দীপকের, 'আসলে তুমি আমাদের এড়াতে চাইছ, তাই না!'

'সে তোমরা যা খুশি ভাবতে পারো।'—রিনি দীপকের কথাটা গায়ে মাখল না।

ঝট্ করে সুভাষ ওর একটা হাত ধরে ফেলে বলল, 'খুব রং নিচ্ছ, অ্যা।'

'কি হচ্ছে হাত ছাড়ো সুভাষ।'—ধা করে মাথায় রক্ত চড়ল রিনির।

'কেন, হাতটা কি তোমার ক্ষয়ে যাচ্ছে নাকি!'—দীপক মুখিয়ে উঠল।

'না-না, ছাড়ো বলছি।'

'না ছাড়লে কি করতে পারো তুমি!'—বিশ্রীভাবে দুপাটি দাঁত বের করে বলল সুভাষ।

এক ঝটকায় ওর মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ফোঁস করে উঠল রিনি, 'অসভ্য ইতর—'

সেকথা শুনে ওরা দুজনে একসঙ্গে বিকট হেসে উঠল। রিনি উল্টোদিকে ঘুরে হনহন করে সামনের দিকে এগুতে লাগল।

সৈকত ট্রাভেলার্সে জামাকাপড় ভরছিল। ওদিকে ডাইনিং টেবিলে কাবেরী আর রিনি। কাল রবিবার ছুটি। খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ওরা দুজনে গল্প করছিল।

রিনি ঘরে ঢুকতে সৈকত বলল, 'আমার কর্ডের প্যান্টটা কোথায়?'

'আলনায়,' রিনি দরজা বন্ধ করে বলল, 'আজকেই গোছগাছের কি হল। ট্রেন তো কাল রাত সাড়ে আটটায়।'

আলনা থেকে প্যান্টটা তুলে নিল সৈকত, 'কাল একদম সময় পাব না। ট্রান্সফার অর্ডারের অফিসিয়াল অ্যাক্সেপটেশনের জন্য হেডঅফিস ছুটতে হবে। সীল-সই-সাবুদ প্লেসমেণ্ট—নানান ঝামেলা রয়েছে!'

'রিজারভেশন হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ অনেক কষ্টে, ট্রাভেলার্স বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট

বের করে সৈকত বলল 'তিন চারটে বুকিং অফিস ঘুরে তবে একটা সীটিং অ্যাকমোডেশন জোগাড় করেছি।'

'একটা কথা বলব।'—সৈকতের দিকে এগিয়ে গেল রিনি।

'কি ?'—পকেট থেকে লাইটার বের করল সৈকত।

'না, থাক—'

'বলোই না'।

সৈকতের চোখে চোখ রাখল রিনি, 'ট্রান্সফার অর্ডারটা ক্যান্সেল করা যায় না ?'

'যাবে না কেন। এখনো পাটনা অফিসে কোন ইন্টিমেশন যায় নি।' লাইটার জ্বালাতে গিয়েও থেমে গেল সৈকত।

'তাহলে তুমি কালই পাটনা চলে যাও !'—রিনি সৈকতের বুকের ওপর একটা হাত রাখল, 'যাতে পৌঁছেই চটপট একটা বাড়ি দেখতে পাবো।' বাড়ির অভাব কি। আমাদের ফার্মের বড় ক্ল্যায়েন্ট সরযুপ্রসাদের গর্দানিবাগে একটা বিরাট বড় বাড়ি আছে। আমি বললেই তার থেকে একটা ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবে। 'কিন্তু—'

'আর কিন্তুটিন্তু নেই, এখানে যা হৈহট্টগোল আর কিছু বলার সুযোগ দিল না রিনি। ওর মুখ থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে মেঝেয় ফেলে দিয়ে বলল 'চলো শুয়ে পড়ি !'

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতে সৈকত দেখল ঘরে আলো জ্বলছে। আর রিনি কনুইয়ে ভর রেখে আধখানা উঠে তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সৈকত। বলল, 'কি ব্যাপার ইঁদুর নাকি !'

রিনি জোর করে ওকে শুইয়ে দিয়ে কাছে টানল। এই প্রথম সৈকতের প্রতি ভালবাসায় তার বুকের ভেতরটা টলটল করে উঠছে।

## পাতাবাহার

ট্রেন প্ল্যাটফরমে ঢুকতে পেছন থেকে গনগনে গলায় গৌরী বলে উঠল, চটচটে নামতে হবে কিন্তু মশাই—

শীলা খেই ধরল, হ্যাঁ। এখানে গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না—

এক হাতে কোঁচা আরেক হাতে মিষ্টির হাড়ি। তার ওপর নতুন পাম্পসু, এরই মধ্যে ডানপায়ের বুড়ো আঙুলে ফোস্কা পড়ে গেছে। তবু ট্রেন থামতেই শ্যামল লাফিয়ে নেমে পড়ল।

শ্যামলের পিছু পিছু নামল শীলা, গৌরী। ইলা তখনো পাদানিতেই দাঁড়িয়ে। ওর পরনে তুঁতে রংয়ের বেনারসী। তুহাত ভরে সোনার বালা, চুরি। গলায় চিক। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ। হাতে একটা রংদার থলে।

শ্যামল এগিয়ে যেতে তাকে ঠেলেঠুলে দিদির হাত থেকে কাপড়ের থলেটা টেনে নিয়ে কলকল করে উঠল শীলা, থাক হয়েছে। আগে নিজেকে সামলান তো মশাই। যা মোটা থলথলে একখানা শরীর—মরে যাই।—কাপড়ের কুচি ঠিক করবার ফাঁকে মুখ বাঁকাল গৌরী। তারপর ফের বলল, বুঝলি শীলু, এইজন্যেই আজকালকার ছেলেদের আমি তু'চক্ষে দেখতে পারি না। এত মেয়েদের পোঁ-ধরা—

ঠোঁটের পাতা ভেঙে মুচকি হাসল শীলা।

মাটি-কাঁপিয়ে ট্রেন চোখের সামনে দিয়ে সরে যেতে একটা চমৎকার ছবি ফুটে উঠল। হল্ট স্টেশন। ওধারে প্ল্যাটফরম নেই। শেষ

# বিষয় দাম্পত্য

শ্রাবণের ভরন্ত নয়নাজুলির মাঝখানে একটা গলাডুব মাথা-ভাঙা তাল-গাছ। তার মাথার দুটো রঙীন পাখি। তারপর আদিগন্ত ধানক্ষেত। বিমুগ্ধ শ্যামল বলে উঠল, দ্যাখো, দ্যাখো শীলা! কি সুন্দর দুটো চন্দনা—

শীলা চোখে রং চশমা লাগাতে লাগতে বলল, কই চন্দনা। ওতো মাছরাঙা—

গৌরী বাড়ি থেকে বেরিয়েই অকরুণ। শীলার কথা শেষ হল না। মাঝপথে ওর ধারালো কণ্ঠস্বর, মাছরাঙাকে চন্দনা বলে, আচ্ছা মানুষ তো! বাঁচাল ইলা। বলল, তোরা কি এখন এখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করবি। বেলা কত হল খেয়াল আছে।

শ্যামল ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল। সারাটা পথ মেয়েদুটো জ্বালিয়েছে। তাকে ইলার কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। অথচ এমন বর্ষণক্লান্ত দিন, জানালার ফ্রেমে কত ছবি। চাষীদের গ্রাম, শস্যক্ষেত্র, আকাশে হাল্কা সাদা মেঘের ওড়াউড়ি, মাঠের ওপর আলোছায়ার খেলা। ভাবতে ভাল লাগছিল শ্যামলের। রেলগাড়ির কামরায় আর কেউ নেই। সে আর ইলা মুখোমুখি। গাড়ি ছুটে চলেছে অনন্তকাল ধরে।

শীলা আর গৌরী তাকে স্বস্তিতে দু-দণ্ড বসতেও দেয়নি। একটানা বকবক করে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। বিয়ে না করলে শ্যামল জানতেই পারত না মেয়েরা এত বকবক করতে পারে। আর এই কারণে সে আসতে চায়নি। কোথাকার কোন সুবোধ মিত্র, ইলাদের দূর সম্পর্কের এক দাদা, শহর থেকে এতটা পথ ভেঙে তার সঙ্গে দেখা করতে আসার কোন মানে হয়। কিন্তু কে তার কথা শুনবে। রাশভারি শ্বশুর। তিনি বলেন: সামাজিকতা বলে একটা কথা আছে বুঝলে। আত্মীয়-স্বজনেরা চায়—বিয়ের পর দুজনে মিলে অন্তত একবার দেখা করে আসবে। নিস্ফল আক্রোশে মনে মনে নিজেরই মুণ্ডপাত করেছে শ্যামল। আজ টালীগঞ্জ কাল ভবানীপুর পরশু বেলেঘাটা। এত ধকল সহ্য করা যায়?

গৌরী বলল, এবার আমরা কোন দিকে এগুবরে শীলা ?

শীলা উত্তর করল, তার আমি কি জানি। সুবোধদার ওখানে আমি তো মোটে একবার গেছি। দিদি বলতে পারবে—

ইলা উত্তর দিকে মুখ তুলে নিচু গলায় বলল, ওই দিকে চল্—

শীলা ইলার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। গৌরীর সমবয়সী। গৌরী ওদের মাসতুতো বোন। শীলার তুলনায় গৌরী অনেক বিচ্ছু। এম-এ ক্লাশে পড়ছে। শীলার পড়াশুনোয় মন নেই তেমন। স্কুলের গণ্ডী কোনক্রমে পার হয়ে এখন দক্ষিণীতে গান শিখছে। চমৎকার গলা। শ্যামলের বিয়ে হয়েছে আজ দিন-পনের হতে চলল। দ্বিরাগমনের পর থেকেই ওরা দৌরাত্ম্য শুরু করে দিয়েছে। দিনের বেলা তাকে ইলার ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয় না। গভীর রাত্তিরের আগে সে বউকে একলা পায় না।

প্ল্যাটফরমের ঢালু পথ ধরে নিচের দিকে নেমে আসার সময় সতর্ক পা ফেলছিল শ্যামল। গৌরী এক হাত ধরে। ধুতিপাঞ্জাবি পরার অভ্যেস নেই। বেসামাল হয়ে একবার পা হড়কে গেলেই কেলেঙ্কারি। গৌরী বলছিল, তোর মনে আছে শীলু, সেই যে, যেবার মুসৌরিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম,'তুই আর আমি গান-হিল'এ উঠে গেছি। আর নামতে পারছিনা—

মাথা নাড়লো শ্যামল, হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমাদেরও একবার এমনি হয়েছিল। দেওঘরে। কয়েকজন বন্ধু মিলে ত্রিকূট পাহাড়ে উঠেছি। নামার সময় দেখি কি খাড়াই—

পেছন থেকে শীলা ধমকে উঠল, থামুন তো মশাই। বিচ্ছিরি স্বভাব। মেয়েদের কথায় নাক গলানো।

নিচে কয়েকটা ঝুপড়ি। চায়ের স্টল। পানবিড়ির দোকান। ঘাসকাটা কল। কাছাকাছি কোথায় মাইকে তারস্বরে ফিল্মী হিন্দী গান বাজছিল।

তাদের দেখে দুটো সাইকেল রিক্সা এগিয়ে এল। শীলা বলল,

কেষ্টপুর যাবে ?

হ্যাঁ—একজন রিক্সাঅলা মাথা নাড়ল।

কতক্ষণ লাগবে ?—গৌরীর প্রশ্ন।

আরেকজন ঘাড়েবুকে গামছা চালাতে চালাতে জবাব দিল, রাস্তাঘাট ভাল নেই। তা প্রায় ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই।

জলকাদা ভাঙতে হবে না তো আবার।—শ্যামল চোখ বড় করল।

ভয় নেই। জল থাকলে আমরা না হয় আপনাকে চ্যাংদোলা করে পার করে দেব, হাসল গৌরী।

রিক্সায় বসা নিয়ে আরেকপ্রস্থ হুড়োহুড়ি বেধে গেল। শ্যামল ইলার রিক্সায় উঠতে যাবে এমন সময় এগিয়ে এল শীলা। তার পাঁজরায় কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বলল, আ-হা-হা, কত মজা—তাই না ? আমি দিদির পাশে বসব।

অগত্যা শ্যামল গৌরীর দিকে এগুল। পাশে বসতে একটা হাত তার কাঁধের ওপর তুলে দিতে দিতে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়তে চাইল গৌরী, দিদির চেয়ে আমি দেখতে কি খারাপ ? বল্ শীলু ?

কি হচ্ছে গৌরী ?—চাপা গলায় ধমকে উঠল ইলা।

সামনের রিক্সায় ইলা আর শীলা। দুধারে বড় বড় গাছের সার। ডালপালার জাফরির ভেতর দিয়ে রোদ টুকরো টুকরো হয়ে গায়ে এসে পড়ছে। ফুরফুর করে সজল হাওয়া বইছে। পাখির সুরেলা ডাক। এক সময় গলা চড়িয়ে শ্যামল বলল, পথটা ভারি সুন্দর। এই জন্যেই পাড়া-গা আমার খুব ভাল লাগে। একটা গান ধরো না শীলা।

শীলা পিঠ বাঁকিয়ে বলে উঠল, শখ কত। বেলা প্রায় বারোটা। খিদেয় পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে—

সুবোধবাবু গেটের সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও প্রিয়দর্শন। টকটকে গায়ের রং। বেশ লম্বা, সু-স্বাস্থ্য।

শান্ত মুখশ্রী।

রিক্সা থামতে সুবোধবাবু হেসে বললেন, কখন থেকে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি—

গৌরী হুড়মুড়্ করে রিক্সা থেকে নেমে পড়ল, দেরি হবে না তো কি। যা অজ পাড়াগাঁয়ে থাকেন—

সুবোধবাবু শ্যামলের দিকে তাকালেন, আসুন—

শীলা বলল, সেকি, জামাইবাবুকে আপনি বলবেন নাকি ?

শ্যামলের নজর এড়াল না। সুবোধবাবুকে দেখে ইলার মুখে হাসির আভা ফুটে উঠেছে। ইলা হেসে ফেলল, দেখছিস শীলু, সুবোধদার গম্ভীর ভাবখানা এতদিনেও গেলনা।

গেট পেরিয়ে তিন বোন হইহই করতে করতে ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। পেছনে শ্যামল আর সুবোধবাবু। সরুনুড়িপাথরের একফালি পথ। দুধারে ফুলের বাগান; সূর্যমুখীতে ভরে আছে। কয়েকটা গন্ধরাজের গাছও চোখে পড়ল। সুবোধবাবু সরকারি চাকুরে। জমির মাপজোপ করেন। কানুনগো। একা মানুষ। হাতে অঢেল সময়। তাই এসব নিয়ে আছেন। বাড়ির পেছন দিকেও অনেকটা জায়গা জুড়ে সবজি খেত। সুবোধবাবু একের পর এক গাছের বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মাথা নাড়লেও শ্যামলের মন অন্যদিকে। সে সুযোগ পেলেই বাড়ির সামনের বারান্দার দিকে চোখ ফেলছিল। শীলা, গৌরী বারান্দায়। ইলাকে দেখা যাচ্ছে না।

ওরা বারান্দায় উঠে আসতে গৌরী বলল, জায়গাটা কি সুন্দর! চারদিক খোলামেলা—

ট্রে হাতে ইলা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আরেক সাজে। একটা আট-পৌড়ে শাড়ি গাছকোমর করে পরা। মুখে ঝিরঝিরে হাসি।

শীলার কথাটা ইলা কেড়ে নিল, সত্যি, কত এসেছি এখানে। তবু প্রত্যেকবার নতুন নতুন লাগে—

শীলা ঠোঁট ওলটাল, সেরেছে। এবার দিদির কাব্য শুরু হয়ে গেল।

ট্রে মেঝেয় নামিয়ে দিল ইলা। সুবোধবাবু মোড়া টেনে শ্যামলকে বসতে বললেন। ইলা বলল, ঘরদোরের কি অবস্থা করে রেখেছেন। তাকানো যায় না। কি করে যে এর ভেতরে থাকেন—

সুবোধবাবুর মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, না মানে—

ইলা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল, আপনারা বসে গল্প করুন। আমি এক্ষুনি আসছি—

চায়ের কাপে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে শীলা বলল, একটা আবৃত্তি করুন না সুবোধদা। সেই যে, রবীন্দ্রনাথের—ভ্রষ্টলগ্ন।

সুবোধবাবু হাসলেন, এখন নয়। সবে তেতে-পুড়ে এলে। পরে করব।—শ্যামলের চোখের দৃষ্টি বারবার ঘুরে যাচ্ছিল। ইলার হাতে ঝাড়ন। খাটের ওপরে উঠে গেছে। তারপর চাদর পাততে শুরু করল।

শীলার ডাকে নড়ে-চড়ে উঠল শ্যামল, জানেন জামাইবাবু। দিদিও ভাল আবৃত্তি করতে পারে। সুবোধদাই শিখিয়েছেন—

ইলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, কিছু গন্ধরাজ এনে দিন না। ফুলদানিতে রাখব।

—আবার এসব ঝামেলা কেন।—বলে সুবোধবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বাগানের দিকে চলে গেলেন।

—চলুন না জামাইবাবু, একটা হাই তুলে বলল গৌরী, বাইরে একটু একটু ঘুরে আসি।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই চলো।—কথা শেষ হবার আগেই উঠে দাঁড়াল শ্যামল। নির্জন পথ, ছায়াছায়া। পানাডোবা। ধানখেত। বাঁশঝোপ। চাষীদের বাড়ি। ভাল লাগছিল না শ্যামলের। ঘুরে ফিরে একই দৃশ্য। তারওপর ঝিঁ ঝিঁ পোকার বিশ্রী ডাক।

শীলা যেন শ্যামলের মনের কথাটা বলে ফেলল, যাই বলিস গৌরী, সুবোধদা যে এখানে একলা কি করে থাকেন—

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যামল, চলো ফেরা যাক।

বেশ বেলা হয়ে গেছে—

গৌরী বলল, আর একটু এগুলে হত না—

শ্যামলের চোখের সামনে তখন অন্য এক ছবি। বারান্দায় ইলা আর সুবোধবাবু মুখোমুখি বসে গল্প করছে। তার গলার স্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল, না—আর নয়—

ছবির সঙ্গে মিল অনেকটাই। বারান্দায় মুখোমুখি মোড়ায় বসেছিল। সুবোধবাবু আর ইলা। ইলার হাতে একগুচ্ছ গন্ধরাজ।

পেছনের বারান্দায় টেবিল পাতা হয়েছে। বারান্দার প্রান্তে রান্নাঘর। চাকর রামলোচন থালায় খাবার সাজাতে লাগল। শ্যামলের একপাশে সুবোধবাবু। আরেক পাশে শীলা। টেবিলের ওধারে ইলা আর গৌরী।

ভাত ভাঙতে ভাঙতে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বলল গৌরী, লজ্জা করে খাবেন না মশাই। শেষে বাড়ি ফিরে গিয়ে যে সুবোধদার অখ্যাতি করবেন তা চলবে না। আপনি যা নিন্দুক পার্টি—

শীলা চেঁচিয়ে উঠল, দেখেছিস গৌরী, সুবোধদার কি পার্শিয়ালিটি, দিদির বাটিতে দুটো মুরগীর ঠ্যাং—

শ্যামল লক্ষ করল, সুবোধবাবুর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে ইলা।

মুখ ধোওয়ার সময় টিউবওয়েলের কাছে ইলাকে একা পাওয়া গেল। শ্যামল ভারি গলায় বলল, এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে কিন্তু। রাতের দিকে তোমার ছোটকাকা আসবেন।

দুচোখের ভুরু জড়ো করল ইলা, কই, ছোটকার তো আজ আসার কথা নয়।

সুবোধবাবুকে আসতে দেখে শ্যামল ইলাকে পাশ কাটিয়ে বারান্দার দিকে এগুল।

গৌরী আর শীলা সাপ-লুডো নিয়ে বসেছে। শ্যামলকে দেখে শীলা বলল, একদান খেলবেন নাকি?

শ্যামল এসে গৌরীর পাশে বসল। শীলা বলল, সাবধান গৌরী; জামাই-বাবু যা চোট্টা—

সুবোধবাবু ঘরের ভেতর দিয়ে বারান্দায় এলেন। কাগজ হাতে। বসলেন গিয়ে বারান্দার আরেক প্রান্তে।

একটু বাদে ইলা এল। বলল, আমিও খেলব।

মাথা ঝাঁকাল শ্যামল, না—না, এখন হবে না। খেলা শুরু হয়ে গেছে। ইলা অল্পক্ষণের জন্য ওদের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বারান্দার ওধারে চলে গেল। সুবোধবাবু চোখ থেকে কাগজ নামালেন। ইলা একটা মোড়া টেনে নিয়ে পাশা-পাশি বসল।

গৌরী বলল, সরে বসুন। আপনি যা অপয়া।

ওধারে শরীর কাঁপিয়ে হাসছে ইলা। সাপের মুখে পড়ে নিচে নেমে যেতে শ্যামল বলল, তোমরা খেলো। আমার আর ভাল লাগছে না।

গৌরীর দান, শুধোল, কোথায় যাচ্ছেন?

শীলা বলল, কোথায় আবার, হেরো। পালাচ্ছে—

শীলার কথায় কর্ণপাত করল না শ্যামল। বড় বড় পা ফেলে গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

রামলোচন রিক্সা নিয়ে এলে গৌরী বলল, 'সব ব্যাপারেই জামাইবাবুর কি তাড়া। একেবারে মেসোমশায়ের স্বভাব পেয়েছে—

গেটের মুখে দাঁড়িয়ে ইলা ফিসফিস করে সুবোধবাবুকে কি সব যেন বলছিল। কথা ফুরুতেই চায় না।

গৌরী ফের বলল, 'এবার আপনি আর দিদি এক রিক্সায় উঠবেন। বাব্‌বা, আপনার যা একখানা শরীর—

কর্কশ গলায় জবাব দিল শ্যামল, তা হবে না। একসঙ্গে যখন এসেছি তখন যাবও একসঙ্গে।

ইলা শীলার পাশে গিয়ে বসল। ওর খোঁপায় কয়েকটা গন্ধরাজ। বলল, এবার কোন কথা শুনছি না সুবোধদা। বিয়ের সময় গেলেন না। আসছে

মাসের শুরুতে আমাদের বাড়িতে আসতেই হবে আপনাকে। নইলে—
স্মিত হাসলেন সুবোধবাবু, আচ্ছা, যাবো—
অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘাড় ফেরাল শ্যামল। গলায় যেন অনেকক্ষণ হল একটা মাছের কাঁটা আটকে আছে। বলল দায়সারা, চলি—

আকাশে সন্ধ্যার রঙ ধরেছে। গাছগাছালি ক্রমশ অন্ধকার তুলে নিচ্ছে বুকে। গৌরী বলল, এবার একটা গান ধর শীলু—
শ্যামলের কপালের দু'পাশের রগগুলো দপ দপ করে জ্বলছিল। সে বলল, না, এখন থাক।
রিক্সা ফাঁকায় এসে পড়ল। অদূরে স্টেশন। শ্যামলের মাথার যন্ত্রণা কমে এল। সে একটা সিগারেট ধরাল। গলগল করে একমুখে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বড় করে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলল, যাক, সময় আছে। পৌনে সাতটার ট্রেনটা পাওয়া যাবে।

## রক্তের ভেতরে সমুদ্র

স্টোভে জল চাপিয়ে ঘরে ঢুকতে অরুণিমা দেখল—শিশির কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ডেকচেয়ারে আধশোয়া শিশির। বুকের ওপর সচিত্র ইংরেজি জার্ণাল, বাঁ হাতটা তার ওপর চাপা। জানালা দিয়ে শরতের রোদ তেরছা হয়ে ওর কোমর অব্দি উঠে এসেছে। ডেকচেয়ারে বসবার আগে জানালার পর্দা তুলে দিয়েছিল শিশির। ওপাশে খানিকটা উঁচুনিচু বালিয়াড়ি। তারপর ঝাউগাছের সার, জড়াজড়ি করে—নিবিড়। সেই ঝাউবীথির ওধারে সমুদ্র। এখান থেকে দেখা যায় না। ঝাউবীথির জটিলতা ভেদ করে দেখা সম্ভবও নয়। তবে চেরা চেরা ঝাউয়ের ফাঁক দিয়ে একটা অদ্ভুত ধরনের শূন্যতা চোখে পড়ে। যাকে না আকাশ না সমুদ্র এমন একটা কিছু বলে মনে হয়। নিচের দিকে সমুদ্র, বৃষ্টিশেষে অশান্ত। ঢেউ ফুঁসছে প্রবল আক্রোশে। যার জলকণা বাষ্পের মত ওই মধ্যবর্তী শূন্যতাকে আশ্চর্য ধূসর করে তুলেছে। সারাটা দিন শিশির ওই দিকে চেয়ে থাকে। অর্থহীন চেয়ে থাকতে ভাল লাগে তার।

অরুণিমা লক্ষ করল—ঘুমিয়ে পড়লেও ওর চোখের পাতার নিচে অক্ষিগোলক দুটো চলাফেরা করছে। ঘুমিয়ে পড়লে শিশিরকে ভীষণ ছেলেমানুষ দেখায়। অরুণিমার ইচ্ছে করছিল এগিয়ে গিয়ে ওকে খানিকক্ষণ আদর করে। কিন্তু পারল না। কেননা, অরুণিমার সারা শরীর তখন জ্বলছে। সকালে সমুদ্রস্নানের পর থেকে বালি কিচকিচ শরীর নিয়ে কাজ করতে অস্বস্তি হচ্ছে তার। বাড়ি

ফিরেই মাংস রান্না। শিশির গতকাল গ্রাম্য হাট থেকে ছুটো মুরগী কিনে এনেছিল। ছোট জায়গা। ভিনিগার জাফরাণ কিছু এখানে পাওয়া যায় না। টাটকা মুরগীর মাংস, অনেকক্ষণ ধরে ফুটিয়ে তবে বুনো গন্ধ ছাড়াতে হয়েছে। শিশির একা খেতে চায়নি। অরুণিমার সঙ্গে খাবে বলে বায়না ধরেছিল। অরুণিমা রাজী হয়নি। একগাদা এঁটোকাটা, গা বালিতে জবজবে।

অরুণিমা পর্দা নামিয়ে দিয়ে বাথরুমে চলে এল। দরজাটা বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবল। শিশির যা দুষ্টু! অ্যাটাচড্ বাথ। একবার ঘুম ভেঙে গেলে জুলজুল চোখে অরুণিমাকে গিলবে। আর জিভ দিয়ে ঠোঁট লালাসিক্ত করবে। অগত্যা অরুণিমা আলতো করে দরজাটা ভেতর থেকে ভেজিয়ে দিল। এবং মনে মনে শিশিরের তারিফ না করে পারল না। চমৎকার কটেজ। ছুটো বড় ঘর। সামনেরটা ড্রইংরুম হিসবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রান্নাঘরটাও বেশ বড়। বাসনকোসন সব আছে। সামনের দিকে গোলমত একফালি বারান্দা। কটেজের সামনে পেছনে লন মত। কিছু ফুলের গাছও আছে। বাথরুমটা সবচেয়ে সুন্দর। ঝকঝকে তকতকে। জল অফুরন্ত, মেলে চব্বিশ ঘণ্টা। সাদা চোখে দেখলে শিশিরকে গোবেচারা, অপটু বলে মনে হলেও—আসলে ওযে রীতিমত দূরদর্শী এই কটেজটা বুক করাতেই তার প্রমাণ মেলে।

বেসিনের কাছে এসে দাঁড়াল অরুণিমা। ঝকঝকে কাচের শার্সিতে ক্লান্ত মুখচ্ছবিখানি ফুটে উঠলে অরুণিমা ফিক করে হেসে উঠল একবার। সকালে সমুদ্রস্নানে যাবার আগে শিশির এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছিল। কাঁধে তোয়ালে, একমুখ সাদা ফেনা। ক্ষুর চালাচ্ছিল গালে। অরুণিমা জল নিতে ভেতরে ঢুকলে ক্ষুরটা বেসিনের ওপরে প্ল্যাস্টিকের তাকে রেখে ঝটিতি ঘুরে তাকে জাপটে ধরেছিল। চিবুকের ঘণ্টানিতে অরুণিমার গালে কপালে বুকের নগ্ন অংশে সাবানের ফেনা লেগে গিয়েছিল। শিশির দুহাতে অরুণিমার মুখখানা নিজের লোমশ বুকের ভেতর টেনে নিয়েছিল। এমনিতে শিশির লাজুক, মুখচোরা।

একটা কথা ঠিকঠাক মত শেষ করতে পারে না। অথচ অরুণিমা কাছে এলে ওযে কি দুর্দান্তই না হয়ে উঠে।

অরুণিমা ধারাযন্ত্র খুলে দিল। জলধারা চুলের নদীনালার ভেতর দিয়ে নেমে তিরতির করে সারা গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। সে কাঁধ থেকে আঁচলটা খসিয়ে নিল। জলের একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। এখানে এসে সকাল বিকেল দুবেলা সে স্নান করে। কলকাতায় যৌথ পরিবারের ভিড়ে ব্যস্ততায় শোওয়া-বসা রুটিন মাফিক। আর এখানে! সে আর শিশির শিশির আর সে—ইচ্ছামত সময়টাকে নিয়ে খেলা করা যায়। তাদের বিয়ে হয়েছে সেই কবে—অঘ্রাণের শুরুতে। আর এখন শরৎকাল। এতদিন বাদে তারা দুজনে বেরুতে পেরেছে। পারিবারিক জীবনে শিশির বেশ খানিকটা নীতিনিয়মের মধ্যে জড়িয়ে থাকতে ভালবাসে। সেই বৈশাখ থেকে অরুণিমা জ্বালাতন করতে শুরু করেছে। চলো, দুজনে কোথাও গিয়ে ক'টা দিন কাটিয়ে আসি। কিছুই ভাল লাগছে না। শিশির ওর কথা গায়ে মাখেনি। কারণটা অরুণিমা আন্দাজ করতে পেরেছে। চলাফেরায় শিশির একালের যুবক হলেও জীবনযাপনের ব্যাপারে ওর কতগুলি সেকেলে প্রাচীনতা রয়েছে। বউকে নিয়ে সকলের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে হনিমুনে বেরুনো—ভাবতেই শিশির ভয়ে জড়োসড়ো। এতটা বেহায়া হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অরুণিমা হাল ছাড়ে নি। বলে বলে শিশিরকে উত্যক্ত করে তুলেছে। শেষে বাধ্য হয়ে—

অরুণিমা চিবুকে সুগন্ধি সাবান ঘসছিল। বাইরে অনতিদূরে সমুদ্র ফুঁসছে। অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে থাকলে মনে হবে সমুদ্রটা বাইরে কোথাও নয়—বুকের ভেতরেই গজরাচ্ছে। অরুণিমা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজেকেই ভেংচাল। দুষ্টুমি করলে যেরকমটা করে শিশিরকে। স্কাইলাইট চুঁইয়ে শরত-দুপুরের গাঢ় রোদ এসে ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। অরুণিমা গলায় সাবান ঘসতে থাকে। এখানে, বাইরের নির্জনতায়, একাকিত্বে এসে শিশির টের পাচ্ছে অরুণিমা তার কতখানি। অরুণিমা তার কাছে

শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই জরুরি। সারাটা দিন অরুণিমার কাটে শিশিরকে নিয়ে। শিশির এখন যেন তার ছেলেবেলাকার সেই রঙীন পুতুলটি। কখন ঘুম থেকে উঠতে হবে, চা সহযোগে দৈনিক পত্রিকা পড়ার জন্য তার কতটুকু সময় বরাদ্দ, বাজার থেকে কি কি জিনিস আনতে হবে, দুপুরে কতটুকু আদর করতে পারবে বউকে—সব ঠিক করে দেয় অরুণিমা। শুধু রাতটুকু, যখন মাথার ওপাশে সমুদ্র ফুঁসছে, জানালার ফ্রেমে ঝাউয়ের সারির ওপরে অন্ধকারে তারার দঙ্গল জ্বলছে নিভছে অবিরাম, যখন ওরা দুজনে পরস্পরের উষ্ণতা দিয়ে বুকের ভেতরকার শব্দহীন সমুদ্রকে জাগিয়ে তুলছে, তখন,—অরুণিমার আর শিশিরের ওপর কোন কর্তৃত্ব থাকে না। অরুণিমা তখন এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারীর পেষণে অসহ্য সুখে জ্বলতে পুড়তে থাকে। কোনদিন সে বলে—আরো কয়েকটা দিন ছুটি বাড়িয়ে নাও না শিশির। কোনদিন বলে, এখানে যদি বরাবরের মত থেকে যেতে পারতাম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে অরুণিমা দেখল—শিশির পাশ ফিরে শুয়ে আছে। অরুণিমার হাসি পেল। কি ছেলেমানুষ লোকটা! অথচ এই লোকটাই যখন জুতো-মোজা টেরিলিনের শার্টপ্যান্ট পরে চোখে রোদ-চশমা লাগিয়ে রাস্তায় বের হয়, তখন অরুণিমার একথা ভাবতেই অবাক লাগে যে, পুরো ছ'ফুট লম্বা দশাসই এই ভদ্রলোকটির দেহ-আত্মা-মন—ভালবাসা-দুঃখ সবকিছু একান্ত ভাবেই তার। আর ঘরের ভেতরে, যেখানে অরুণিমা ছাড়া আর কেউ নেই, অরুণিমার কাছ থেকে একটু অনাদর পেলেই ওর দুচোখ অভিমানে টসটসে হয়ে ওঠে। অরুণিমার ভয় শুধু এইটুকু—মাঝেমাঝে শিশির কেমন আনমনা হয়ে যায়। সোনার বোতামটা কোথায় গেল? যা, ম্যানিব্যাগটা হোয়াটনটের ওপরেই তো রেখেছিলাম। জুতোর কালিটা খুঁজে পাচ্ছি না; আজ বেরুব কি করে। আমার কলম, আমার কলম। বাঃ, তুমিই তো বললে মটর শুটি আনতে। বাবার কাছে চিঠি লিখে এই টেবিলেই তো রেখেছিলাম।—এসব সময় অরুণিমা ছাড়া গত্যন্তর নেই

এসেপ্রথমটায়ওকে সেকষে একচোট ধমকায়। মুহূর্তে জিনিসগুলো খুঁজে দিয়ে ওর দায়িত্বহীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় অরুণিমা। বলে ঃ যা ভুলো মন, শেষে একদিন দেখব, আমাকেই না—। আর শিশির তখন হা-হা করে হাসতে হাসতে কাছে এগিয়ে এসে অরুণিমাকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে বলে ওঠে ঃ রাণি, রাণি আমার। ওই-টুকই অরুণিমার উপরি পাওনা।

সেদিন বিকেলে অব্দি বিছানায় গড়াচ্ছিল শিশির। শিয়রের কাছে চায়ের বাটি রেখে অরুণিমা রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। প্রতি-দিন সন্ধ্যায় সমুদ্র সৈকতে বসতে না বসতেই ফিরে আসতে হয়। রান্নার তাড়া থাকে।

রান্নাঘর থেকে বড় ঘরে আসতে অরুণিমা দেখে—অবাক কাণ্ড। শিশির কখন জামাজুতো পরে তৈরি। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। শিশির মস্তা-নের মত হাত নেড়ে বলল, কই! এখনো হল না তোমার! অরুণিমা চোখ পাকাল, ওরে পাজি! আজ আমাকে উল্টো চাপ দেওয়া হচ্ছে। দাঁড়াও—, মশলা মাখা হাতসমেত হাসতে হাসতে অরুণিমা গড়িয়ে পড়ে শিশিরের বুকে।

ভাঙা বিকেলে ওরা এসে বসল 'বে'-কাফেতে। দোতলায়। সমুদ্রের পাড়ে এই একটা রেস্তোরাঁ। সামনে গরম কফির পাত্র। অরুণিমা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। শেষবিকেলের আকাশ ঘন ঘন রঙ পাল্টা-চ্ছিল। কাল রাতে খুব জলঝড় হয়ে গেছে। আজ বেশ ক'দিন হল ওরা এখানে। এমন ভয়ঙ্কর সমুদ্র আগে ওরা দেখেনি।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন চাপা গলায় ডাকল, এই অরু, অরু।—ঘাড় ফেরাতে অরুণিমার বুকের ভেতর এক ঝলক বিদ্যুৎ নেচে উঠল। এ যে রেণু চাকলাদার। এক সময় অরুণিমাদের ফরডাইস লেনের বাড়িতে ভাড়া থাক'ত। দেখতে ভারি সুন্দর মেয়েটি। টানাটানা শান্ত চোখ, পাতলা ঠোঁট, আমে-দুধে মেশানো গায়ের রঙ, সবচেয়ে আকর্ষণীয় ওর দেহলতা।

সুঠাম এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ। রেণুর রবীন্দ্রসংগীতে দারুণ গলা। সিঁথির দিকে চোখ পড়তে অরুণিমা বুঝল এখনো ওর বিয়ে হয়নি। একসময় অতনু মিত্র নামে একটি ছেলের সঙ্গে ওর ভালবাসা ছিল। সকলে বলত ওদের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত খেয়ালী পুরুষ অতনু বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল। হঠাৎ ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাতারাতি আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে দিব্যি ঘর-সংসার করছে। কারণটা স্পষ্ট না জানলেও অরুণিমা আঁচ করতে পারে। পুরুষ জাতটাই বড্ড আবেগ-প্রবণ। তুলনায় মেয়েরা প্রেমের ক্ষেত্রে সিরিয়াস। অতনু ছিল আর্টিষ্ট। ছবি আঁকত। একদিন যেমন রেণুকে মনে ধরেছিল, তেমনি আরেকদিন হঠাৎ করে ওকে ছেড়ে দিতেও বাধেনি। নইলে, অরুণিমা জানে—অতনুকে ভালবাসার ব্যাপারে রেণুর তরফ থেকে কোনই খামতি ছিল না।

অরুণিমা চেয়ার থেকে উঠে প্রায় লাফিয়ে রেণুকে ধরে ফেলল। বলল দুচোখে খুশির ঢেউ তুলে, তুই, রেণু!

—হ্যাঁ আমি। দিন চারেক হল এসেছি এখানে। উঠেছি সারদা বোর্ডিং'এ। সঙ্গে আরো কয়েকজন মিস্ট্রেস আছেন।

অরুণিমা ওর দুহাত ধরে ছেলেবেলাকার মত দোলাতে দোলাতে বলল, উফ্, বল দেখি—কদ্দিন বাদে দেখা! বছর পাঁচেক হবে না!

রেণু মাথা নেড়ে হাসল, তা তো হবেই—

এক পলকে রেণুকে জরিপ করে ফেলল অরুণিমা। রেণুর মুখে খানিক ম্লানিমা, কিন্তু জলুস কমেনি ওর। এখনো চোখের দৃষ্টি আগের মতই স্নিগ্ধ হৃদয়-কাড়ানো।

রেণু শিশিরের দিকে তাকাল। বিব্রত শিশির মুখ নামিয়ে সিগ্রেট টানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রেণু ফিসফিস করে বলল, ওই বুঝি তোর বর। চমৎকার দেখতে তো। তবে বেশ গোবেচারা বলে মনে হয়।

অরুণিমা অল্প করে হাসল। স্বামীকে কেউ নিরীহ বলে ভাবলে সব স্ত্রীরই বেশ ভাল লাগে। অরুণিমা রেণুর হাত ধরে টানল। বলল, আয়

আমাদের টেবিলে। আলাপ করিয়ে দিই—

রেণু এসে পাশের চেয়ারে বসতে গেলে শিশির ধড়মড়িয়ে উঠতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে কফির বাটি উল্টে খানিকটা কফি শিশিরের দামি কর্ডের প্যান্টে চলকে পড়ল। রেণুর মত গম্ভীর রুচিশীল মেয়েও শেষ পর্যন্ত না হেসে পারল না।

অরুণিমা বান্ধবীর সঙ্গে শিশিরকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। রেণুর গুণপনার কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিস্তারিতভাবে বলল। রেণুর অস্বস্তি হচ্ছিল। সে মাঝেমাঝে অরুণিমাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে শিশিরকে ছোটখাটো প্রশ্ন করছিল। শিশির ঘামছিল। উত্তর দিতে গিয়ে বারবার অহেতুক ঘড়ির ব্যাণ্ড আলগা করে গলা খাকারি দিয়ে নিজের লাজুক স্বভাবের পরিচয় দিচ্ছিল। শেষের দিকে ভাঙা ভাঙা গলায় একবার সাহস করে বলেছিল, একদিন আসুন না আমাদের কট্'এ, আপনার গান শুনব—

অরুণিমা গলা ছেড়ে বয়কে ডাকল। নতুন করে কফি আর কেকের অর্ডার দিল। সে শিশিরের গলদঘর্ম ভাবখানা দেখে বেজায় মজা পাচ্ছিল। ঘরে মানুষটা কি ভয়ানক নির্লজ্জ। আর বাইরে—। বোঝো এবার—

শেষ পর্যন্ত রেণুই রেহাই দিয়েছিল শিশিরকে। অরুণিমার চালটা সে ধরে ফেলেছিল। কফির বাটিতে চুমুক দিতে দিতে রেণু একসময় গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। সেই অবকাশে শিশির সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

বাড়ি ফেরার পথে শিশির আশ্চর্য নীরব হয়ে গিয়েছিল। অরুণিমা একলাই বকবক করে যাচ্ছিল। সব কথাই রেণু-বিষয়ক। ওর বাড়ি ওর প্রণয় কাহিনী সম্পর্কিত টুকরো টুকরো কথা। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ অরুণিমার খেয়াল হল—এতটা পথ সে যা বলে গেছে তার বিন্দুবিসর্গ কানে ঢোকেনি শিশিরের। তাই একসময় সে কথা থামিয়ে কড়া গলায় বলল, এই, কি ভাবছ !—অন্ধকারে শিশিরের মুখ দেখা যাচ্ছিল না।

ও উদাস সুরে জবাব দিল, কিছুই না, এম্নি—

—মানে?—নাছোড়বান্দা অরুণিমা।

—মানে কিছুই নয়। সব সময় বকবক করতে ভাল লাগেনা। শিশিরের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি ফুটে উঠল।

—রেণুকে কেমন লাগল বললে না তো?—অরুণিমা প্রশ্ন করল।

—ভালই। জলদমন্দ্র স্বরে উত্তর করল শিশির।

—ওকে কাল আমাদের কটে খাবার নেমতন্ন করেছি কিন্তু।—অরুণিমা বলল।

—তাই বুঝি। আমি তো জানি না—,শিশিরের গলার স্বর বেশ ভারি।

—তুমি জানবে কি। তুমি কি সব কথা শোনা। শুনতে চাও?—আবেগময় গলা অরুণিমার।

—না করলেই পারতে।

—কি?

—এই, নেমতন্ন।

—কেন?

—এখানে এসেছি দুজনে ইচ্ছেমত ঘুরতে বেড়াতে। ফালতু এসব ঝামেলা।

—ঝামেলা কিসের! রাঁধব তো আমি। তাছাড়া, সব সময় তো আমরা বেড়াচ্ছি না।

—না, ঠিক তা নয়, বোধহয় হাসল শিশির, একটা দুপুর নষ্ট হবে। তাই বলছিলাম—

অরুণিমার বুকের মেঘটা হাল্কা হল। শিশিরের হাতে চিমটি কেটে বলল, অসভ্য!

পরদিন ঠিক সময়ে রেণু এসে হাজির। সকাল থেকে ফের গজরাচ্ছিল শিশির: কোথায় দুটো দিন নিরিবিলি কাটাবো, তা নয়, শুধু ঝামেলা

বাড়ানো।—অরুণিমা জবাবে বলেছে, কত ভালবাসে দেখ। বলতেই রাজি হয়েছিল। না আসতে বললে চূড়ান্ত অসভ্যতা হত।—আসলে অরুণিমার মতলবটা অন্য রকমের। দু'জনে একাকি কাটানোর মধ্যে একটা ক্লান্তি আছে। তাই এটা অরুণিনার এক মজার খেলা। নতুন পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীকে দেখতে কার না ভাল লাগে। রেণুর সামনে শিশিরের বোকা বোকা ভাবখানা···বেশ লাগে তার।

রেণু রীতিমত সাজগোজ করে এসেছিল। মুখে আলতো করে পাউডারের প্রলেপ। চোখের নিচের পাতায় হাল্কা কাজলের টান। কপালে সবেদা রঙের টিপ। খাটাও ভয়েলের শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ছোপ ছোপ মখমলের ব্লাউজ পরেছে। হাতে রঙদার বটুয়া। পায়ে তরমুজ রঙের একজোড়া শ্লিপার। সবকিছুর মধ্যে একটা উগ্রতার ছাপ আছে। রেণুকে হাত ধরে টেনে বসিয়েছিল অরুণিমা। শিশির তখন শোবার ঘরে। রেণুর সাড়া পেয়েই খাটের ওপর পা তুলে অহেতুক খবরের কাগজে চোখ ডুবিয়ে দিয়েছিল। অরুণিমা এসে চাপা ধমকের সুরে বলল, ব্যাপার কি! এখানে বসে আছো কেন। সামনের ঘরে রেণু একলা বসে রয়েছে। এদিকে আমার রান্না এখনো শেষ হয়নি। তুমি একবার এ্যাটেণ্ড করবে তো!

বিরস বদনে উত্তর করল শিশির, ওসব এ্যাটেণ্ড ফাটেণ্ড আমি করতে পারব না। আমি তো আর নেমতন্ন করিনি।

এক টানে শিশিরের হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে বলল অরুণিমা, বাজে বোকা না। অভদ্রতার একটা সীমা আছে।

অরুণিমার ধমক খেয়ে রাগে গজগজ করতে করতে শিশির খাট থেকে নেমে ড্রাইংরুমের দিকে চলে গেল। শিশির যেতে রেণুই কথা জুড়ে দিল। মেয়েরা সহজেই ছেলেদের বুঝতে পারে। দুচারটে কথার পর শিশিরের আড়ষ্টতাও কেটে যেতে লাগল। বাইরে শরতের আকাশ নীল। আধভেজা দরজা দিয়ে ঝাউবাথি সমেত কুয়শার মত শূন্যতা সমুদ্রের সংকেত দিচ্ছিল। শরতের সোনালী রোদ সামনের লনে ঘাসের ওপর পড়ে

চিকচিক করছিল।

শান্ত রেণু সহজ সুরে নানান গল্প করছিল। এক এক সময় রেণুর সংযত অথচ হাস্যোজ্জ্বল বলার ভঙ্গীতে শিশির হেসে উঠছিল। শিশির জানত না কথার ফাঁকে সে-ও কখন সহজ হয়ে উঠেছে। একসময় ওদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে মৃদু তর্ক শুরু হয়ে গেল। একবার অসহিষ্ণু গলায় কিছু একটা বলতে গিয়ে খেয়াল হল শিশিরের রেণুর স্নিগ্ধ চোখদুটি অপলক তার দিকে স্থির হয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে শিশির একটু জোর গলায় বলে উঠল, অরুণিমা, কদ্দূর।

খাওয়া দাওয়ার পর সামনের বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে ওরা তিনজন যখন সাপলুডো খেলতে বসেছে তখন বেলা আড়াইটার মত। প্রথম দিকে, কয়েক দানের মধ্যেই রেণু মই বেয়ে তরতর করে অনেকটা উঁচুতে উঠে গেল। অরুণিমা তখনো ঘরেই ঢুকতে পারে নি। ওর দানে কিছুতেই এক আসছিল না। রেণু শিশিরের মুখোমুখি বসে। অরুণিমা লক্ষ করছিল--রেণু যখন ওপরের দিকে উঠছে, শিশিরের লাজুক মুখখানা ততই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। প্রত্যেকটা নিরর্থক দানের পর অরুণিমা কপট বিরক্তি প্রকাশ করছিল। এবং তাতে উল্লসিত হচ্ছিল শিশির। অরুণিমা বুঝল—বারবার তার ব্যর্থতা যেন শিশিরকে উষ্ণ করে তুলছে।

এক দানে রেণু নয়ের ঘরে চলে গেলে শিশির আর নিজেকে সামলাতে পারল না। অরুণিমা তখনো ঘরে ঢুকতে পারেনি। শিশির পাঁচের ঘরে। আনন্দে সে হাত বাড়িয়ে রেণুর করতল স্পর্শ করে বলে উঠল, সো মেনি থ্যাঙ্কস টু ইউ। হোয়াট এ স্‌প্লেনডিড গেম্‌।

অরুণিমা লক্ষ করল—রেণুকে স্পর্শ করার সময় শিশিরের দৃষ্টি ওর শান্ত চোখের মণিতে স্থির নিবদ্ধ। রেণুর অলক্ষ্যে অরুণিমা শিশিরের হাতে আস্তে করে একটা চিমটি কাটল। শিশির ফিরে তাকাতে চোখ মটকে নীরব ইশারায় অরুণিমা যেন বলতে চাইল, এই, হচ্ছে কি !

পরের দানেই রেণু একশ'র ঘরে পৌঁছল। শিশির বলল, এবার প্রথম

দান আমার। —অরুণিমা তখন মাতুর থেকে উঠে পড়েছে। রেণু বলল, একি অরু, উঠছিল যে বড়! সবে তো একবার খেলা হল।

অরুণিমা স্মিত হাসল, তোরা খেল, আমি চায়ের জলটা চাপিয়ে আসি। শিশির ততক্ষণে নতুন করে খেলার জন্যে নড়েচড়ে আঁট হয়ে বসেছে। সে বলল, ছেড়ে দিন ওকে। আসুন, তুজনেই খেলা যাক। ও হেরো—

মুখ টিপে হাসছিল শিশির। অরুণিমা শিশিরের দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল, হেরো আমি! দাঁড়াও চা করে আসছি। দেখাচ্ছি তোমার মজা।

অরুণিমা কথাগুলো এমন অঙ্গভঙ্গি করে বলে উঠল যে—ওর কথা শেষ হতেই রেণু এবং শিশির পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সশব্দে হেসে উঠল।

অরুণিমা রান্নাঘরে বসে লুচি ভাজছিল। সকালে বাজার থেকে আনাজ তরকারির সঙ্গে শিশির কয়েকটা গাজর নিয়ে এসেছিল। গাজর সেদ্ধ করে অরুণিমা তরিবত করে আগেই হালুয়া তৈরি করে রেখেছিল। কেট-লিটা উনুনে চাপিয়ে জানালার দিকে চোখ ফেরাতে সে দেখল—রোদ গুড়িসুড়ি মেরে ঝাউবীথির দিকে উঠে যাচ্ছে।

বারান্দায় রেণু আর শিশির বসে। ওরা নিচু স্বরে কথা বলছে। অরুণিমা একপ্রস্থ চা দিয়ে ফের ফিরে এল রান্নাঘরে। লুচির সঙ্গে হালুয়া দিলে চলবে না। কিছু ভাজাভুজি চাই শিশিরের। বারান্দায় মুখোমুখি বসে রেণু আর শিশির। ওরা খেলা শেষ করে গল্প করছে। মাঝে মাঝে ওদের হাসির শব্দ এসে অরুণিমার কানে পৌঁচচ্ছে। বেগুনভাজা আর আলু পেয়াজের তরকারি করার ফাঁকে ভাবছিল অরুণিমা—যাক, এতদিনে তাহলে মানুষটা বাইরের একজনের কাছে সপ্রতিভ হয়ে উঠতে পারল। শিশির যা লাজুক। বিশেষ করে মেয়েদের মুখোমুখি হলে তো আর কথাই নেই। কানের লতি মুহূর্তে লাল হয়ে উঠে। গলার স্বর কেঁপে যায়। যেন মেয়েরা ভিন্ন গ্রহের জীব। অরুণিমা চায়—শিশির

মেয়েদের সঙ্গে ফ্রিলি মেলামেশা করতে শিখুক। স্বামী কথাবার্তায় চটপটে হোক—এটা সকল মেয়েই চায়।

রেণুর পাল্লায় পড়ে ও যে এত তাড়াতাড়ি স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারবে তা অরুণিমা ভাবতেই পারেনি। এবং এই উপলব্ধি তার চিন্তায় গড়িয়ে যেতে সে মনে মনে খুব খুশি। খানিকটা আত্মপ্রসাদও লাভ করল। কেননা, রেণু তো উপলক্ষ মাত্র। তার স্বামী সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারছে—এটাই বড়ো কথা।

অরুণিমা ট্রে-তে চায়ের পট এবং জলখাবার সাজিয়ে সামনের বারান্দায় এসে দেখল রেণু হাঁটু ভাঁজ করে বসে ঝাউবীথির দিকে মুখ তুলে নিচু গলায় রবীন্দ্রসংগীত গাইছে। শরতের ওপর লেখা সেই গানটা। যেটা শিশিরের প্রিয়। শরতের প্রভাতকালের আলোয় প্রাণ যেন কাকে চাইছে। যে ধরা দেবে কবি তার পায়েই নিজেকে সঁপে দেবেন বলে ঘোষণা করছেন। অরুণিমাকে দেখে শিশির তাকে ইশারায় দাঁড়াতে বলল। সন্ধ্যায় ছায়া নামছে চারদিকে। ঝাউবনে মাতামাতি শুরু হয়ে গেছে। আকাশে দিনের শেষ রোদটুকু রক্তিম হয়ে উঠছে। অল্প অল্প বাতাস বইছে। রেণুর কানের দুপাশে কিছু চুল উড়ছে। শিশিরের দৃষ্টি ওর দিকেই। মাঝে মাঝে তার মাথা দুলে উঠছে।

অরুণিমার সাড়া পেয়ে চটপট গান থামাল রেণু। শিশির হাততালি দিয়ে উঠল, চমৎকার আপনার গলা! সত্যি বলছি মিস চাকলাদার, একেবারে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত।

রেণু অরুণিমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ক্লাসিকাল গান ও আরো গাইতে পারে।

শিশির বলল, ওসব উচ্চাঙ্গ সংগীত আমাদের মাথায় ঢোকে না। আমরা হচ্ছি কাঠখোট্টা মানুষ।

গাজরের হালুয়া জিভে তুলে নিতে নিতে রেণু বলল, গ্রাণ্ড রেঁধেছিস অরু। একেবারে মাসিমার মত।

শিশির আজ সত্যি প্রগল্‌ভ। বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, কার সঙ্গে কার

তুলনা করছেন। আমার শশ্রূমাতাঠাকুরাণীর রান্নার সিকি ভাগের একভাগও---

রেণু বলল, এটা কিন্তু ঠিক বলছেন না। সত্যি ভাল হয়েছে হালুয়াটা।

অরুণিমা হাসতে চাইল, এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করার কোন মানেই হয় না। তোর ভালো লেগেছে বলে ওরও যে লাগবে এর কোন মানে নেই।

রেণু চোখ মটকে শুধোল শিশিরকে, কি মশাই ! সত্যি বলছেন, না—

শিশির ভাবলেশহীন থাকতে চাইল, মিথ্যে বলে লাভ তো কিছু নেই, বরং আখেরে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

রেণু রহস্য করতে ছাড়ল না, ভাল লাগছে না কাকে। গাজরের হালুয়া না খোদ আমার বান্ধবীটিকেই—

শিশির উদাস গলায় বলল, কি করে বলব। এখনো ঠিকমত পরখ পারলাম কই—

অরুণিমার কপালের দুপাশের শিরা দপ দপ করে জ্বলছিল। মাথার ভেতর মৃদু যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠছে।

সন্ধ্যা ঝিঁকিয়ে নামছে। চা পর্ব শেষ করে রেণু বলল, চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। আয় অরু, একটু লনে ঘুরি।

শিশির সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল তার কথায়, ঠিক বলছেন। চলুন—

যন্ত্রণাটা অক্ষিগোলকের ভেতর নেমে আসছে। অরুণিমা বলল, তোরা যা। আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে। আমি বরং—

শিশির বলল, মাথা ধরেছে। কই আগে তো বলোনি।

অরুণিমা হাসল মনে মনে। মুখে বলল না কিছু। মাথা ধরা কি কারুর আগেভাগে জানান দিয়ে আসে !

রেণু বলল, তাহলে আমাদের সঙ্গে চল। বাইরের হাওয়ায় বসলে ছেড়ে যাবে। ও আমারও হয়।

অরুণিমা ততক্ষণে ভেতরে ভেতরে দৃঢ় হয়ে উঠেছে। বলল, তোরা যা না। আমি খানিকক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি খাব। শরীরটাও ভাল নেই

তেমন।

ভেতরের ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে যন্ত্রণাটা শুধু মাথায় নয়—সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। অবেলায় স্নান, অনেকক্ষণ ধরে আগুনের সামনে বসে রান্না। অরুণিমা বুঝতে পারছিল—এখন কসে একটা ঘুম লাগাতে পারলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে উঠত।

বাইরে লনে, ঝাউবীথির ছায়াসন্নিহিত অন্ধকারে রেণু আর শিশির চলা-ফেরা করছিল। সমুদ্রের চাপা গর্জন ছাপিয়ে থেকে থেকে ওদের যৌথ হাসির শব্দ ভেসে আসছিল। অন্ধকারে ওরা দুজন। রেণু আর শিশির। মাথার অনেক ওপরে আকাশ। পায়ের তলায় নরম ঘাস। ওধারে ঝাউয়ের সার। তার ওপাশে বর্ণহীন শূন্যতা। অরুণিমা অনু-ভব করল, ব্যথাটা শুধু মাথায় নয়, কানে দু'পাশের ফুলে ওঠা শিরায় বুকে পায়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

রাতে তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে গেল। রান্নাঘরের শেকল তুলে ঘরে এসে দেখল অরুণিমা শিশির খবরের কাগজে মাথা গুঁজে আধ-শোওয়া পড়ে আছে। সে ছুটে এসে শিশিরের হাত থেকে কাগজটা টেনে মেঝেয় ছুঁড়ে দিল। শিশির কিছুই বলল না। ভ্রূক্ষেপহীন চোখ রাখল কড়িকাঠের দিকে।

অরুণিমা বলল, সারাদিন একটা না একটা কাগজে চোখ ডুবিয়ে রেখে কি যে পড়ো।

শিশির শরীরটা ধনুকের মত বেঁকিয়ে দুহাত শূন্যে তুলে বড় করে একটা হাই তুলল। অরুণিমা খাটের ওপরে উঠে এল। শিশিরের লোমশ বুকে ভেজা হাত রাখল। বলল, তারপর বলো, কেমন লাগল রেণুকে?

শিশির অন্যমনা বলল, ভালই।

—ভাল মানে?

—ভাল মানে ভাল।

—তা তো বুঝেছি! যা বকবকানির বহর তোমার।

শিশির ফের একটা হাই তুলল, আলোটা নিভিয়ে দাও না। চোখে বড় লাগছে।

অরুণিমা খাট থেকে নেমে এল। মাথার যন্ত্রণাটা অনেকক্ষণ হল কমে গেছে। রেণু চলে যেতে অরুণিমা ফের স্নান করেছিল। মুখে গলায় ঘাড়ে বুকে সাবান ঘসে ঘসে শরীরটাকে রমণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছে। এখন তার মন বাতাসের মত হালকা, ফুরফুরে। কাচের শার্সিগুলো বন্ধ করে আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠে আসতে টের পেল—শিশির দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে কোলবালিশ আঁকড়ে শুয়ে আছে।

অরুণিমা বলল, ঘুমুলে নাকি?

শিশির উত্তর করল না।

অরুণিমা ওর পিঠে হাত রেখে ঝাঁকিয়ে ডাকল, এই-ই, শুনছ—

শিশির অল্প নড়ে উঠল। অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, কি?

অরুণিমা শিশিরের ঘনিষ্ঠ হল। আঙুলের নখ দিয়ে শিশিরের পিঠে নরম করে আঁচড় কাটতে কাটতে বলল, বলছিলাম কি—

শিশির সাড়া দিল না।

ফের বলল অরুণিমা, চলো যাই, সমুদ্র আর ভাল লাগছে না।

শিশিরের গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, সে কি! কালকেই তো তুমি বললে আর কটা দিন ছুটি বাড়িয়ে নিতে!

নীরবে বারকয়েক শিশিরের পিঠে মুখ ঘসে নিয়ে এক সময় বলল অরুণিমা, বলেছিলাম, কিন্তু এখন আর ভাল লাগছে না। বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে।

শিশির কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর এক সময় বলল, নাও, এখন ঘুমোও তো। ওসব কথা কালকে ভাবা যাবে।

শিশির ঝটপট ঘুমিয়ে পড়ল। অরুণিমা জেগে। কখন পাশ ফিরে কাচের শার্সির দিকে চোখ রেখেছে। শার্সির ওধারে ঝাউবীথির নিবিড়তায় অন্ধকার নিরেট। তারাও দেখা যাচ্ছে না। থেকে থেকে গুরু গুরু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হয়ত আজ রাতেই বৃষ্টি নামবে। মাঝে মাঝে

সমুদ্রের গর্জনও কানে আসছিল। অরুণিমার মনে হলো, সেই শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারকে আরো ঘনিয়ে তুলছে। অরুণিমা ভয় পেল। ভাবল একবার ডাকবে শিশিরকে। কিন্তু ডাকল না শেষ পর্যন্ত। শিশির যদি বিরক্ত হয়। অরুণিমারও হৃদপিণ্ডের ভেতরে ভয়টা মাথা তুলছে। সে বালিশে মুখ গুঁজে শান্ত হতে চাইল।

রেণু প্রতিদিন আসে। ওর স্কুল খুলবে নভেম্বরের মাঝামাঝি। পুরো ছুটিটা ওর এখানেই কাটানোর ইচ্ছা। শিশিরের ভাল একজন সঙ্গিনী জুটেছে। এখন শিশির উল্টে অরুণিমাকে বলে, তোমার বান্ধবীটির প্রশংসা না করে পারছিনে। দুজনে একবারে যেন হাঁপিরে উঠেছিলাম। অরুণিমা উত্তর করে না। শুধু হাসে মুখ টিপে। শিশিরের প্রশংসায় একটা সত্য লুকিয়ে আছে বৈকি। রেণুর মত প্রাণোচ্ছল আমুদে মেয়ে মেলা ভার। তাছাড়া যথেষ্ট বুদ্ধিমতিও। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি হলে, আশ্চর্য, ও কেমন করে যেন ধরে ফেলে। গান গেয়ে, লুডো খেলে, দুজনকে সমুদ্রতীরে টেনে নিয়ে গিয়ে গল্প করে হেসে চেঁচিয়ে ওদের মুখে হাসি ফোটায়। এর মধ্যে একদিন রেণুর পরামর্শ মত ঝাউবীথির ছায়ায় বালিয়াড়িতে চড়ুইভাতি হয়েছিল। অনতিদূরে তারকাঁটার ওধারে দীর্ঘ পটভূমির শেষে নীল সমুদ্র। সারিবদ্ধ ঝাউয়ের জটিলতা ভেদ করে রোদ এসে পড়তে পারে না জায়গাটিতে। সাত সকালে থলিতে করে বড় সাইজের একটা লেগ হর্ণ নিয়ে কটেজের সামনে এসে চিৎকার করে ওদের ঘুম ভাঙিয়েছিল রেণু। তাছাড়া সাত সতেরো তরকারিও ছিল সঙ্গে। বালি দিয়ে চমৎকার উনুন তৈরি করে-ছিল রেণু। অরুণিমা বসে তরকারি কুটছিল। মুরগীটা কেটেছিল শিশির। গলায় ছুরির ফলা বসিয়ে দিতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে-ছিল। মুরগীটা বালিতে নিস্ফল দাপানাপি করেছিল কিছুক্ষণ। আর্তনাদ করে উঠেছিল অদ্ভুত স্বরে।

তরকারি ফেলে ছুটে এসেছিল অরুণিমা। চেঁচিয়ে বলেছিল, এই, কি হচ্ছে! মেরে ফেলো না ওটাকে।

শিশিরের কব্জিতে গলায় তাজা রক্তের ছোপ। শিশির শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠে রেণুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেছিল, দেখুন ম্যাডাম। আপনার বান্ধবীর কাণ্ডখানা। কি ভিতু !

দুপুরের রান্না শেষ হতে সমস্যা দেখা দিল। তিনজন একসঙ্গে কি ক'রে সমুদ্রস্নানে যা'বে। শেষ পর্যন্ত সমাধানের পথটা বা'লে দিয়েছিল অরুণিমা। বলছিল, আমি আজ আর সমুদ্রে স্নান করব না। কাল রাতেও বেজায় মাথা ধরেছিল। রেণু বলেছিল, তা হয় না। তুই না গেলে আমিও যাব না। এক যাত্রায় পৃথক ফল, তা হবে না-বালির ভেতর পা ডুবিয়ে একটা ঝাউগাছে হেলান দিয়ে শিশির উদাসীনভাবে সিগ্রেট টানছিল। রেণুর কথার মাঝখানে ও বলে উঠল, ও যাবে না। চলুন আমরা যাই। ওর যা পিতপিতে—

তারপর এগিয়ে রেণুর একটা হাত ধরে ফেলেছিল শিশির। নেমে গিয়েছিল বালিয়াড়ি ভেঙে বেলাভূমিতে। সেদিন সমুদ্র ছিল অশান্ত। জোয়ারের সময়। বড় বড় ঢেউগুলো অদূরে ফুঁসছিল। আর সেই গর্জনের শব্দ। বেশিক্ষণ কান পাতলে অরুণিমার মনে হয় সমুদ্রটা বুঝি নাচতে নাচতে হৃদ্‌পিণ্ডের ভেতর ঢুকে পড়ল। মধ্যদিনেও আকাশ ছিল আশ্চর্য নীল। ওরা দুজন হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের দিকে এগুচ্ছিল। শিশিরের খালি গা, পরনে খাটো একটা খাকির প্যাণ্ট। রেণুর শাড়ীর আঁচল উড়ে উড়ে শিশিরের চওড়া কাঁধ ঢেকে দিচ্ছিল বারবার। ওরা অনেক দূরে সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে অনেক চেষ্টা করেও ঝাউবীথির ছায়াতল থেকে শিশির রেণুকে আলাদা করে অরুণিমা চিনতে পারে নি! আসলে তখন রেণু আর শিশির হাত ধরাধরি করে ক্রমশ নিজদের ব্যবধান ঘুচিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর রেণু এসে হাজির। শিশির ডেকচেয়ারে বসে একটা সস্তা দামের ইংরেজি নভেল পড়ছিল। পাশে অরুণিমা, মোড়ায় বসে।

উলসুতো বুনছিল। বিকেলের দিকে একবার অরুণিমা সমুদ্রতীরে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। শিশির গা করেনি। নিম্নমুখে বলেছিল, আজ থাক্।

রেণু তড়বড় ক'রে ঘরে ঢুকে বলেছিল, কিরে অরু, তোরা ঘরে বসে যে! আজ বেরোসনি ?

অরুণিমার হঠাৎ কেনই জানি মনে হয়েছিল আজকে তারা বেরোবে না, জানত রেণু। বলেছিল মলিন হেসে, নারে, ওর শরীরটা ভাল নেই। কথাটা শেষ করার আগে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছিল অরুণিমা রেণু ঘরে ঢুকতেই বইটা কোলে নামিয়ে রেখে শিশির সপ্রতিভ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

রেণু শিশিরের দিকে এগিয়ে এসে বলেছিল, উঠুন তো মশাই, ভয়ঙ্কর কুঁড়ে আপনি। চলুন, থিয়েটার দেখে আসি।

অরুণিমা শুধিয়েছিল, থিয়েটার! কোথায় ?

রেণু বলেছিল, এখানকার ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসের স্টাফেরা থিয়েটার করছে। কাফেটোরিয়ার পেছনের মাঠে। বিসর্জন নাটক হবে।

শিশির হেসেছিল, আপনার আদেশ। স্ত্রীর বান্ধবী বলে কথা। না মেনে উপায় কি।

কথাটা শেষ করেই আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছিল শিশির।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

ওরা প্রথমে গিয়েছিল বে কাফেতে। কফি খেয়ে কাফেটেরিয়ার মাঠের দিকে আসার সময় অরুণিমা লক্ষ করছিল কথা বলার ফাঁকে সে রেণু আর শিশিরেব কাছ থেকে বার বার পেছিয়ে পড়ছে।

নাটক তেমন একটা কিছু ভাল হচ্ছিল না। অভিনেতারা সকলেই অপটু। রেণু আর অরুণিমা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। শিশির দুই সার লোকের পেছনে। মাঝেমাঝে অরুণিমা পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল শিশির আর দশজনের চেয়ে লম্বা বলে ওকে ভিড়ের মধ্যে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল না।

নাটকটা ধীরে ধীরে জমে উঠছিল। জয়সিংহ আত্মহত্যা করছে। রঘুপতি বুক কাঁপিয়ে বিলাপ করছে। তন্ময় অরুণিমা একবার পাশের দিকে চোখ ফেরাতেই বুকের ভেতর বিদ্যুৎ খেলে গেল। রেণু নেই পাশে। পেছন ফিরে তাকিয়েছিল অরুণিমা। শিশিরকেও দেখা যায়নি। সামনের দিকে চোখ ফেরাতে সে দেখেছিল—রক্তাক্ত জয়সিংহ বেদীর কাছে পড়ে আছে।

রঘুপতি হাহাকার করছে। অরুণিমার পা টলছিল, মাথার যন্ত্রণাটা চতুর্গুণ হয়ে উঠেছিল। সামনের মাঠে আধো অন্ধকারে ইতস্তত লোকজন ছড়িয়ে। কিছু লোক চায়ের স্টলের সামনে জটলা করছিল। অভিমানে ক্ষোভে থরথরিয়ে কাঁপছিল অরুণিমা। অন্ধকারের আড়াল ছিল বলে রক্ষা। কিছুক্ষণ মাঠের চারপাশে অনির্দেশ্য ঘুরে একসময় সে কটেজে চলে এসেছিল।

কাঠের গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতে অরুণিমা দেখেছিল—বারান্দায় আলো জ্বলছে। সিঁড়ির ধাপে শিশির আর রেণু পাশাপাশি বসে। ওরা নিচু স্বরে কথা বলছিল।

অরুণিমা তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, কি ব্যাপার, তোমরা আমাকে না জানিয়ে চলে এলে যে বড়—

শিশির জ্বলন্ত সিগ্রেটে টান দিয়ে নিয়ে বলেছিল উত্তাপহীন গলায়, কি করব। ভাল লাগছিল না, তাই চলে এলাম—

অরুণিমা সিঁড়ির ধাপে এক পা তুলে দিয়ে বলেছিল, তা আমাকে ডাকলে না কেন?

শিশির অল্প হাসল, বারে! তুমি যে অ্যাবজরবড হয়ে দেখছিলে। অরুণিমা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে রেণুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর দুজনে খাটে বসেছিল। হাসতে হাসতে বলেছিল অরুণিমা, নে, একটা গান গা তো। পরশু চলে যাচ্ছি আমরা। আবার কবে দেখা হবে তোর সঙ্গে কে জানে।

রেণুকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। শান্ত টানা টানা চোখের পাতায় কাজলের রেখা আঁকলে ওকে যে কি সুন্দর দেখায়।
রেণু প্রতিবাদ করেনি। গলা ছেড়ে পরপর কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিল আর তখন, অরুণিমা লক্ষ করছিল, জানালার ওধারে ড্রইং-রুমের অন্ধকারে একটা আলোর ফুলকি অনবরত চলাফেরা করছে।

পরদিন দুপুর গড়াতে রেণু এসেছিল। অরুণিমা জানত রেণু আসবে। এবং রেণু এলেই তার হৃৎপিণ্ডের ভেতরকার সমুদ্রটা জেগে উঠবে। অরুণিমা শোবার ঘরে বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে এলো চুলে শুয়েছিল। আর শিশির ড্রইংরুমে, ডেকচেয়ারে আধশোওয়া, সচিত্র ইংরেজি জার্ণাল গিলছিল।
বারান্দায় পদশব্দ জেগে উঠতে অরুণিমা হাটু ভাঁজ করে পাশ বালিশটা কাছে টেনে নিয়ে এল। সে বুঝতে পারছিল—প্রতিদিনের মত আজকেও মাথা ধরবে। তার কপালের দুপাশের রগগুলো দপদপ করে জ্বলছিল।
অরুণিমা শুনতে পেল, রেণু শিশিরকে বলছে, কই উঠুন, দেরি হয়ে গেলে আর সানসেট দেখা যাবে না, নদীর মোহনা এখান থেকে কম করে মাইল দেড়েকের পথ।
শিশির উঠল। দরজার হ্যাচে শব্দ জাগল। শিশির বাথরুমে ঢুকল। রেণু বেতের মোড়ায় বসেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই শিশির বেরিয়ে এল। রেণু শুধোল, অরু কোথায়?
শিশির বলল, ভেতরের ঘরে, ঘুমোচ্ছে বোধহয়।
রেণু চাপা ধমকে উঠল, আচ্ছা মানুষ তো! ডাকুন ওকে।
শিশির বলল, ওকি যাবে?
—কেন যাবে না?
—কি জানি। আজকাল তো সব সময়ই ওর মাথা ধরে থাকে।
—তবু একবার ডাকুন।

শিশির ভেতরের ঘরে এল। অরুণিমা তখন চোখ বুঁজে কপট ঘুমে আচ্ছন্ন। শিশির ডাকল, এই, এই—

অরুণিমা বলল, কি হল—

—ওঠো। শিশির নিচু গলায় বলল।

অরুণিমা উঠে বসল। হাতের তালু দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল. কি ব্যাপার ?

শিশির আমতা আমতা করে বলল, বারে, বেড়াতে যাবে না !

অরুণিমা খোঁপা তৈরি করতে করতে বলল, বেড়াতে, এই ভরদুপুরে, কোথায় ?

শিশির হাসতে চাইল, ওহো, তোমাকে তো বলাই হয় নি। এখান থেকে কিছু দূরে একটা নদী এসে পড়েছে সমুদ্রে। সেখানে সানসেট দেখতে যাব। সবাই বলে—সে নাকি এক ওয়াণ্ডারফুল দৃশ্য।

অরুণিমা হাসল, সবাই বলে মানে ?

—মানে আবার কি ?

—রেণু এসেছে ?

—হ্যাঁ।

—আমি যাব না, তোমরা যাও।

—তা হয় না। তোমাকেও যেতে হবে।

—সত্যি বলছ ?

শিশির বিব্রত বোধ করল। বলল, পাগলামি কোরো না। চটপট তৈরি হয়ে নাও।

অরুণিমা সজোরে মাথা নাড়ল। বলল, অসম্ভব। এই রোদ্দুরে অতটা পথ আমি কিছুতেই হাঁটতে পারব না।

ইতিমধ্যে রেণু এঘরে ঢুকে পড়েছে। রেণু এগিয়ে এসে বলল, কি ব্যাপার ?

অরুণিমা পরিষ্কার গলায় বলল, আমি যাব নারে। শরীরটা তেমন ভাল নেই।

রেণু কিছু একটা ইঙ্গিত করতে চাইল, শরীর ভাল নেই মানে ?

বিব্রত শিশির ততক্ষণে ড্রইংরুমে চলে গেছে।

অরুণিমা হাসল, না, সে সব কিছু নয়। সকাল থেকে মাথাটা ধরে আছে। অতটা পথ হাঁটতে পারব নারে। বোস, চা করে আনছি। ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়ে ছিল সাড়ে চারটে নাগাদ। আগে শিশির পেছনে রেণু। অরুণিমা সিঁড়ির থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। রেণু সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পেছন ফিরে হাত বাড়িয়ে একবার অরুণিমার হাতটা ধরেছিল, অরুণিমা হাসছিল। রেণু বলেছিল, বড্ড একগুঁয়ে তুই। এত করে বললাম। কিছুতেই রাজি হলি না। এখন একলা ঘরে বসে মর্ মুখপুড়ি।

ওরা দুজনে গেট পেরিয়ে বালিয়াড়িতে উঠল। ধীরে ধীরে ঝাউবীথির ভেতরে ঢুকে পড়ল। অরুণিমা তখনো দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ ওদের দেখা যাচ্ছিল। এখন আর দেখা যাচ্ছে না। ঝাউয়ের জটিলতায় ওরা নিকটবর্তী হতে হতে সমুদ্র আর আকাশের মধ্যবর্তি শূন্যতার দিকে এগুতে এগুতে এক সময় হারিয়ে গেল।

অরুণিমা এখন বাথরুমে। এই মাত্র বাইরের দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকেছে। অরুণিমা বাথরুমে ঢুকবার আগে সেই জানালাটার কাছে একবার দাঁড়িয়েছিল—যেখান থেকে রোজ দুপুরে শিশির শরতের আকাশ, ঝাউবীথি, কুয়াশার মত শূন্যতাকে দেখে।

আজ অরুণিমা ধারযন্ত্র খুলল না। বেসিনের ট্যাপটা খুলে দিল। চীনে-মাটির মসৃণ সাদা টবে স্বচ্ছ জল লাফিয়ে নামছিল। স্কাইলাইটের অনতিপ্রশস্ত ফাঁক দিয়ে শেষ বিকেলের আলো নেমে আসছিল। অরুণিমা বুঝল—সূর্যাস্তের আর বেশি দেরি নেই।

ঝকঝকে আয়নার কাচে অরুণিমার মুখ ভেসে উঠছে। যন্ত্রণাটা এখন শুধু আর মাথায় নয়। অরুণিমা বুঝে উঠতে পারল না—ব্যথাটা ঠিক কোথায়। মাথায় বুকে পিঠে কোমরে না হৃদ্‌পিণ্ডের ভেতরে। ঠিক করে ধরতে পারল না সে। অরুণিমা হাসতে চাইল। কাচে ঢেউ

খেলল। অরুণিমা দেখল, বেসিনের ওপর প্ল্যাষ্টিকের তাকে শিশিরের রাখা চকচকে ক্ষুরটা পড়ে আছে। অরুণিমা আবার হাসল। আবার ঝকঝকে কাচের অদৃশ্য পর্দায় ঢেউ খেলে গেল। অরুণিমা এবার আর হাসল না। ভাবতে চেষ্টা করল, শিশির আর রেণু আর রেণু আর শিশির (হায়, অরুণিমা সরকার নামে কোন মেয়ে কি কোনদিন জন্মেছিল পৃথিবীতে! (—এখন অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। নদীর মোহনা কি দেখা যাচ্ছে। অরুণিমা আলতো করে ক্ষুরটা তুলে নিল তাক থেকে। তারপর ছোঁয়াল গলায়। ওরা এখন কোথায়? ভাবতে চাইল অরুণিমা। নদীর মোহনায় পোঁছেগেছে! ওরা এখন কি করছে? পরস্পরের হাত ধরে সূর্যাস্ত দেখছে। সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে ক্রমশ নিকটবর্তি হচ্ছে। ওরা, রেণু আর শিশির, শিশির আর রেণু। বিড়বিড় করে উঠল অরুণিমা। শিশির, শিশির। তুমি-তুমি—তুমি! বেসিন জলে ভরে যাচ্ছে। বেসিনের জল জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠছে। আরো জোরে ক্ষুরটা গলার ভেতরে চালিয়ে দিতে চাইল অরুণিমা।

অরুণিমা যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণ, সে দেখেছে—আয়নার ঝকঝকে কাচের স্বচ্ছতা থেকে ধীরে ধীরে অরুণিমা সরকারের মুখ মুছে যাচ্ছে। এবং ক্রমশ একটা রক্তের ফুল ফুটে উঠছে। গাঢ় রক্ত। রক্ত, রক্তের ফুল। সূর্যাস্তের মতই লাল। অরুণিমা যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণ, অরুণিমা দেখেছে, ততক্ষণ—

## পুরুষ

সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই উঠোনের কোণাকুণি চোখ রাখল তপন। ওদিকে একচিলতে বারান্দা। শোবার ঘরের সঙ্গে রান্নাঘর। তারপর উঠোন কলতলা এইটুকু নিয়ে গীতার দিনরাতের জীবন, ঘরকরণার গণ্ডী। উঠোনের আর একপাশে টগর দড়িতে কাপড় শুকুতে ব্যস্ত। এক পলকে চারপাশে চোখ ঘুরিয়েও গীতার পাত্তা মিলল না। বেলা দুটো। ছুটির দিন। এতক্ষণ তপন পাড়ার তাসেরআড্ডায় জমেছিল। উঠোনের পথটুকু শেষ করে ঘরে ঢুকবার আগে সে ফের রান্নাঘরের দিকে ঠারিয়ে নিল। সকালবেলা তুচ্ছ কারণে গীতারসঙ্গেকথা-কাটাকাটি হয়েছিল। ওর সেজো মামা না কে যেন কাত্রাসগড় থেকে বহুদিনবাদে কলকাতায় এসেছে। গতকাল রাতে আলো নিভিয়ে বুকের ভেতর চলে আসবার আগেই গীতা বলেছিল, কাল সকালসকাল ভবানীপুরে যেতে হবে। আমাদের নেমন্তন্ন। সেজোমামা অনেক দিন বাদে এলেন। তপন ওর গালে চিবুক ঘষে নিরাসক্ত জবাব দিয়েছিল, কাল তো হবে না। সমীরকে বিকেলের দিকে আসতে বলেছি। ওকে নিয়ে একবার সোনাদির বাড়ি যাব।—সোনাদি তপনের খুড়তুতো বোন। সোদপুরে থাকে। সমীর ওর ছোটভাই। গীতা নিজেকে দুহাতে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছে, তা কি করে হবে। আমি আজ বাবাকে ফোন করে জানিয়ে দিলুম, কাল দুজনে যাচ্ছি। অন্ধকারেও তপন টের পেয়েছিল—গীতা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তপন নির্ভেজাল মিথ্যে বলে ওকে কাটান দিতে চেয়েছিল। সমীরের

সঙ্গে তার গত দু'সপ্তাহের ভেতর দেখাই হয়নি। বিয়ের পর দু-বছর ঘুরে গেছে। এখন আর মিথ্যে বলতে বাধে না তাছাড়া উপায়ই বা কি। মেয়েদের এই যা ভয়ানক নেশা। সুযোগ পেলেই বাপের বাড়ি ছোটা। তা-ও একলা হলে বলার কিছু থাকে না। সে-বেলা ওরা অবলা। পতিদেবতাকে সঙ্গে নিতে হবে। নইলে শোভা বাড়ে না, সম্মানহানির সম্ভাবনা থাকে। তপনের পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। ছুটির দিন। গায়ে গা লাগিয়ে গল্প করবে, আদর কাড়বে। বিকেলের দিকে সিনেমায় যাবে। ফিরতি পথে রাতের খাওয়াটা হোটেলে সেরে নেবে। একঘেয়ে দাম্পত্য-জীবনে খানিকটা অ্যাডভেঞ্চার, মুখবদলও বলা যেতে পারে। তপন হতাশ সুরে বলেছিল, বাবাকে ফোন করেছ? তাহলে আর আমার অনুমতি চাইছ কেন?—গীতা ফের ওর চওড়া বুকে মুখ ডুবিয়ে বলেছিল, না, মানে তুমি আগে তো কিছু বলনি। জানলে ফোন করতুম না। তপন ভেতরে ভেতরে পাথর হয়ে গিয়েছিল। ও জানতো এরপর স্বামীত্বের অভিমান নিয়ে দু'কথা বলতে গেলে রাতটাই বিষিয়ে যাবে। অগত্যা নিজেকে শাসন করে গীতাকে যথাবিহিত কিছুটা আদর করে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘরে ঢুকে খাটের দিকে চোখ পড়তে তপন দেখল, গীতার সায়া শাড়ি ব্লাউজ একপাশে পড়ে আছে। সবকিছু কেমন এলোমেলো। টাইমপিসটা বন্ধ, সকালে দম পড়েনি। ড্রেসিং-টেবিলের ডালা খোলা, ক্রিমের কৌটা মেঝেয় গড়াচ্ছে। পাউডারের পাফ আলমারির মাথায়। তপন আস্তে করে পাঞ্জাবিটা খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিল। সকালে কলতলা থেকে মুখ ধুয়ে ঘরে এসে প্রতিদিনেরঅভ্যাসমত তপন বলেছিল, কই পয়সা দাও, বাজার যেতে হবে না!—গীতা আলমারি খুলে কিসব বের করছিল। মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, তার মানে! তপনের তখনো রাতের কথা মনে পড়েনি। শনিবার রাতে তার ঘুমটা জোরাল হয়। রবিবার ছুটি। আগের দিনের সব ভাবনা গাঢ় ঘুমে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। তপন বলেছিল, আজকে একটু মাংস আনব ভাবছি। দেরি করে গেলে

লাইনের পেছনে পড়তে হবে। আলমারির পাল্লা সশব্দে বন্ধ করে গীতা ঝটিতি জানালার দিকে চলে যেতে তপনের গতরাতের কথা মনে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে হো-হো করে হেসে উঠে গীতার দিকে এগিয়ে বলেছিল, ও হো, একেবারেই মনে ছিলনা, সরি।—লোহার সরু তারে বাঁধা অর্কিডের টবটা জানালার শিকে ঝুলিয়ে দিতে দিতে গীতা বলেছিল, তা মনে থাকবে কেন, আমার বাপের বাড়ি যে!—গীতার এ ধরনের খোঁটা অনেকদিন হল তপনের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তপন জানত, আর একটু ধৈর্য ধরে কিছুটা তোষামোদ করলেই গীতা জল হয়ে ঝলমলিয়ে উঠবে। কিন্তু, কি জানি কেন তপনের মেজাজও হঠাৎ দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছিল। সে থেমে গিয়ে থমথমে গলায় বলেছিল। ও কথা বোলো না গীতা। আজ আমাদের বিয়ে দু-বছর পেরিয়ে গেল, এর ভেতর কতবার তোমাদের বাড়ি গিয়েছি—একবার নিজেই ভেবে ছাখো না। গীতা ঘুরে তাকে পাশ কাটিয়ে খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, অনেকবার গিয়েছ ঠিক, কিন্তু ভাল মনে নয়। আমি তো জানি, নেহাৎ দায়ে পড়ে—। গীতার অকৃতজ্ঞতায় তপনের গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। বস্তুত বলতে গেলে ওকে সুখী করার জন্যই ফি সপ্তাহে একবার করে ছুটির দিনটা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে মাটি করে আসে। তপন আয়নার দিকে চোখ রেখে বলেছিল, ঠিক আছে বাবা, আমার অন্যায় হয়েছে। এবার জামাকাপড় পরে তৈরি হও তো।—গীতা তখনও নাছোড়বান্দা। মেয়েদের এক ধরনের গোঁ থাকে, যাকে নির্বুদ্ধিতা বা হৃদয়হীনতা বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কারণটা তুচ্ছ কি বৃহৎ সেটা বড় কথা নয়। গীতা খাটের কাছ থেকে দরজার দিকে চলে যাচ্ছিল। তপনের মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে গিয়েছিল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গলার স্বর চড়িয়ে বলেছিল, কোথায় যাচ্ছ?—গীতা দেয়ালের দিকে মুখ তুলেছিল, রান্নাঘরে, হাঁড়ি ঠেলতে হবে না?—ওর নরম মুখখানা মুহূর্তে কঠিন হয়ে কদর্য দেখাচ্ছিল। রেগে গেলে গীতা ভিন্নমানুষ, চেনাই যায় না। তপন বলেছিল, তাহলে তুমি ভবানীপুর যাবে না?—গীতা ওর চোখে চোখ রেখে অবাক হবার ভান করে বলেছিল, ওমা, আমি কি যাবার কথা

বলেছি ? তুমি তোমার কাজে যাও না, ব্যস্ত মানুষ।—গীতা চলে যেতে তপন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। গীতা ফেরেনি। শেষে টগর ঘরে আসতে তপন বলেছিল, মা-র কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যাহোক কিছু বাজার করে নিয়ে আসিস। আমি চললাম।

তপন স্যাণ্ডেল জোড়া দরজার দিকে ঠেলে খাটে এসে বসল। কলতলার দিকে গীতার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তপন একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বুকটা ভরাট করতে চাইল। ইদানিং গীতার রাগের অভিব্যক্তিটা মারাত্মক। প্রথমে দু-এক পশলা চেঁচাবে। তারপর মুখে ছিপি এঁটে দম্ খিঁচে থাকবে। এমনটা কখনও দুতিন দিনও চলে। এটা তপনের পক্ষে অসহ্য। একসঙ্গে শোওয়া-বসা, অথচ রা-টি নেই। শেষে তাকেই এগুতে হয়। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে গীতাকে সহজ করে তুলতে প্রাণান্ত।

টগর ঘরে ঢুকতে তপন নড়ে চড়ে উঠে বলল, গীতা কই রে টগর ?—টগর আলনার কাপড় গুছিয়ে রাখতে রাখতে জবাব দিল, এই তো কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেল।—বিয়ের পর ট্রাঙ্ক আলমারি ড্রেসিং-টেবিলের সঙ্গে টগরও গীতার পিছুপিছু এ সংসারে এসেছে। গীতা বাপের আদুরে মেয়ে। তপন অফিসে। মেয়ের সারাদিনের শূন্যতা ভরাট করবার জন্যে টগরকেও বিচক্ষণ শ্বশুরমশায় সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। ওদের বাড়ির অনেককালের ঝি। তপন খাট থেকে দু-পা মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে যথাসম্ভব উদাসীন স্বরে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেল কিছু বলে গেছে ?—টগর দরজার দিকে ফিরে যাচ্ছিল। দাঁড়াল, না, কিছু তো বলে যায় নি। শুধু বললে, রান্নাঘরে খাবার ঢেকে রেখে গেলাম। দাদাবাবু এলে খেয়ে নিতে বলিস। —তপন-গীতার ভাল-মন্দও এতদিনে সহজেই বুঝতে শিখেছে। ওদের মন-কষাকষি হলে টগর কেমন নিরাসক্ত হয়ে যায়। তপনের ধারণা ও খানিকটা মজা পায়। ছোটবয়সে বিধবা। ওদের কলহে ওর লাভটা বেশি। তপনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হলে গীতা টগরকে নিয়ে জোট বাঁধে। টগর তখন গীতার অনুগত। গীতার প্রশ্রয় ও প্রভাবে টগরও তপনকে চতুরতার সঙ্গেই উপেক্ষা করে।

তপন বলল, ও খেয়ে গেছে ?—টগর বারান্দায় পড়ে জানাল, হ্যাঁ। সঙ্গে এক ভদ্রলোক ছিল, তিনিও খেলেন।—তপন নীরবে হাসল। প্রশ্নের অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক কিছু বলে ব্যাপারটাকে উসকে দেওয়ার শুভ ইচ্ছায় টগর যে রীতিমত পটু, একথা মনে হতে তপন খানিকটা দমে গেল। সে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইল না। জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, তুই খেয়ে নে। আমার একটু দেরি হবে।

টগর চলে যেতে তপন আর একটা সিগ্রেট ধরাল। উঠে দৈনিক কাগজখানা নিয়ে বসল। কিছুতেই কাগজের খবরে মন বসাতে পারল না। পরপর কয়েকটা উদাস ধোঁয়ার রিং তুলল। শীতের বেলা। ঘর তাপহীন হয়েআসছে। শূন্য ঘরেক্রমশ সে বিষাদিত হয়ে উঠছিল। তার খিদেয় বুক জ্বলছে। অথচ, এই মুহূর্তে ওঠবার মত উৎসাহও তার নেই। ভদ্রলোক যে গীতার সেজোমামা একথা ধরে নিতে তপনের কষ্ট হল না। নিজের ওপর খানিকটা রাগ হল। ছেলেবেলায় বাপ-মা মারা গেছে, ফলে সে বরাবর একটু আবেগপ্রবণ। গীতাকে সে যথাসর্বস্ব দিয়ে ভালবেসেছে। ওর সুখ ও আরামের দিকে সর্বক্ষণ নজর দিচ্ছে। বন্ধু, পরিচিত জন সব ত্যাগ করে গীতাকে নিয়ে মেতে আছে আজ দুবছর। হঠাৎ-ই নীরদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তপনের। নীরদ তার বাল্যবন্ধু, বিবেচক। একদিন কথাচ্ছলে বলেছিল, মেয়েজাতটা বড় স্বার্থপর। ওদের যতটুকু দেওয়া দরকার তার চেয়ে বেশি দিতে নেই। বেশি দিলে মনে করে ওটাই ন্যায্য পাওনা। এবং সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শেষে স্বামীকেই অস্বীকার করতে শুরু করে।—কথাটা সত্যি। নইলে এতটা সাহস কোথেকে পায় গীতা। তার অভিভাবকত্ব স্বীকার না করুক, অন্তত ঘরের বউ হিসেবে চলাফেরার ব্যাপারে স্বামীর মতামতটা তো নেবে। আসলে, তলিয়ে ভাবতে গেলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অনেকটা কেনা-বেচা বা দর-কষাকষির মত। প্রেম ভালবাসা এসব ভুয়ো কথা। স্বার্থে একটু টান পড়লেই আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে। ভালবাসা সম্পর্কে তপনের নিজস্ব একটা ধারণা আছে। শরীর ছুঁলেই ভালবাসা আসে না। দেহ-সম্ভোগ একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার, ওতে ত্যাগ

কোথায়। আত্মসুখটাই বড়। ভালবাসা বলতে বোঝায় সহনশীলতা এবং স্বার্থ-বিসর্জন। এদিক থেকে তপন চেষ্টার ত্রুটি করেনি। গীতা যখন যা বায়না ধরেছে, শাড়ি গয়না সিনেমা বাপের বাড়ির যাবতীয় সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে যাওয়া, শহরের পথে ঘুরে বেড়ানো, তপন সাধ্যের অতীত ওর মন জুগিয়ে চলেছে। আর, তার প্রতিদানে এই ব্যবহার।

পাশের বাড়ির রেডিওতে অনুরোধের আসর শুরু হলে তপন উঠল। সে ভাবল, এই মুহূর্তে ভবানীপুরে গেলে কেমন হয়। ও বাড়ির লোকজন খানিকটা অবাক হয়ে যাবে। ছোট শালী পুতুল দরজা খুলে ঠোঁট উল্টে বলবে, শেষপর্যন্ত আসতে পারলে!—তারপর গল্পগুজব, কথা চালাচালি করে একসময় গীতাকে জল করে ফেলা যাবে। তপন বাইরে বেরিয়ে পাশের ডাক্তার-খানায় উঠল। ভাবল, যাবার আগে একটা ফোন করে নিলে ভাল হয়। কেননা, ওরা এতদিন বাদে পাওয়া সেজোমামাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। এতটা পথ ঠেঙিয়ে ভবানীপুরে গিয়ে শুকনো মুখে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলে ছুটির দিনটা কাটানো এক অসহ্য ব্যাপার।

ফোন ধরল শ্যালক অধীর। বললে, গীতা তো এখানে আসেনি। মাকে ডেকে দেব?—ওর কথা শুনে তপনের মাথায় রক্ত চড়ল। অনিচ্ছা-সত্বেও বলল, ঠিক আছে, ডেকে দাও।

সৌদামিনী, গীতার মা এসে ফোন ধরলেন, বললেন, কে বাবা, তপন? এপাশ থেকে তপন বলল, গীতা আপনাদের ওখানে যায়নি?

সৌদামিনী বললেন, না তো! ও সকালে একবার ফোন করেছিল। তোমাদের নাকি কোথায় যাবার কথা আছে আজ।

তপন সরল গলায় বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। তারপর তো ওর আপনাদের ওখানে যাবার কথা। সেজোমামা আসেন নি?

সৌদামিনী বললেন, গতকাল সকালের ট্রেনে শম্ভু এসেছে। গীতা কালকে ফোন করে বলল আসবে। ওরা সেইমত সিনেমার টিকিট কিনেছিল। গীতা এল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ঝুনুকে সঙ্গে নিয়ে এই তো

কিছুক্ষণ আগে শম্ভু বেরিয়ে গেল।

রিসিভার নামিয়ে পাথর হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তপন। তারপর কম্পাউণ্ডারকে পয়সা দিতে গিয়ে সুধাংশুর সঙ্গে দেখা। সুধাংশু পুরনো বন্ধু। একই সঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়ছে। ও ওষুধ কিনছিল। তপনকে দেখতে পেয়ে বলল, আরে, কি খবর তোর? শালা, বিয়ে করে দেখি ডুমুরের ফুল হয়ে গেছিস। দেখাই মেলে না —।

সুধাংশুটা একই রকম রয়ে গেছে। সামাজিক জ্ঞানগম্যি ওর বরাবর একটু কম। তপন বলল, তোকেও তো দেখতে পাই না।

সুধাংশু হাত ধরে টানল, চল আমার বাড়িতে। গল্প করা যাবে। কতদিন দিন বাদে দেখা হল।

ইচ্ছা না থাকলেও তপন ওর সঙ্গে পথে নামল। এই মুহূর্তে সে কারুর সঙ্গ কামনা করছিল।

সুধাংশুর বাড়ি কাছেই। ভেতরে ঢুকতে মিতালি বলল, কি ব্যাপার, অনেকদিন বাদে, কি মনে করে? —সুধাংশুর বাইরের ঘরখানা বেশ ছিমছাম করে সাজানো। চেয়ার টেবিল দেয়ালে উড়ন্ত পাখি এ্যাকোয়িয়ামে রঙীন মাছ। সুধাংশু বলল, ভাল করে দু'কাপ চা করো মিতু। মিতালি চা করতে ভেতরের ঘরে চলে গেল। ছোট সংসার, এক ছেলে এক মেয়ে আর অনুগত স্ত্রী। ছেলেবেলা থেকেই তপন সুধাংশুকে খানিকটা অবহেলার চোখে দেখত। পড়াশুনোয় একেবারেই মাথা ছিল না। তাছাড়া খানিকটা বোকাও বটে। মিতালি চা নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, গীতার কি খবর, ছেলেপুলে হচ্ছে কিছু?

বিরক্ত হতে গিয়েও তপন মলিন হাসল, না, তেমন কোন লক্ষণ তো দেখছি না। —সাধারণ আটপৌড়ে ঘরের মেয়েদের এছাড়া অন্য কোন কথা বলার থাকে না। আগে হলে, তপন মনে মনে এদের করুণা করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না। এখন খানিকটা ঈর্ষা হল।

মিতালি বলল, কি ব্যাপার, গম্ভীর দেখছি, গীতার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়নি তো?

সুধাংশু এগিয়ে চায়ের কাপ তপনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, ওদের কথা ছাড়ো। শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রী। একটু আধটু খটনটি তো হবেই।
শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তপন সুধাংশুর খোঁচাটা হজম করল। এবং কথাটা যে আংশিক সত্য একথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এরপর সুধাংশু একতরফা বকবক করে যাচ্ছিল। সমস্তই সাংসারিক কথা। ছেলেমেয়ের অসুখ পড়াশুনোর কথা, মিতালির মহত্ত্ব ইত্যাদি। সুধাংশু কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না মিতালি। শেষটায় বাঁচাল। বলল, না এবার তপনদাকে ছেড়ে দাও। ছুটির দিন, গীতা একলা ঘরে। সকলে তো আর তোমার মত বেরসিক নয়।
রাস্তায় নেমে তপনের পা সরছিল না। মাথার ভেতর তখন সাঁই সাঁই করে আগুন ছুটছে। তার সমস্ত চিন্তা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল! গীতা ভবানীপুর যায়নি, তবে কোথায় গেল? একলা বেরুবার মেয়েও নয়। তবে কি, কোন যুবকের সঙ্গে, কোন পূর্বপ্রণয়ী হয়তো এ ষড়যন্ত্রের ভেতর আছে! বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে গীতা। বি, এ, ক্লাস অবধি কলেজে পড়তে অনেক ছেলের সংস্পর্শে এসেছে। সুহাস সোমেন রজত, আরো কত ছেলের নাম বিছানায় শুয়ে রসিকতা করে বলে গীতা গভীর করে কাছে টেনে আদর করবার সময় তপন যখন বলে, এ-শর্মা না থাকলে তুমি কোন চুলোয় যেতে—। গীতা রহস্য করে কখনও-সখনও উত্তরে বলে, ইস্, নিজের সম্পর্কে এত উঁচু ধারণা ভাল নয়। এখনও ডাকলে রজত সোমেন ওরা ছুটে এসে লুফে নেবে।
রাস্তার মোড়ে এক অন্ধ ভিখারি হাত বাড়িয়ে বলল, বাবু একটা পয়সা— তপন খেঁকিয়ে উঠল, পয়সা নেই, মাপ করো। ভিখিরিদের পয়সা দেবার ব্যাপারে তপন সদাই মুক্তহস্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে তার সমস্ত মন বিষিয়ে আছে। মানুষকে সহানুভূতি দেখিয়ে কোন লাভ নেই। সব স্বার্থপর। তপন কাছের পার্কের ভেতরে ঢুকল। বেশ শীত পড়েছে। তবু সে নিরিবিলি অন্ধকারে একটা গাছের আড়ালে বসল। জগৎ-সংসার সব কিছু তার কাছে মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে। এত করেও গীতাকে ধরে রাখতে

পারছে না সে। আসলে মেয়ে মানেই এক একটা ডাইনী।…এর চেয়ে আলাদা হওয়া ভাল। যেমন অমিয় করেছে, বছরতিনেক না ঘুরতেই বৌকে ডাইভোর্স করল। এখন রাস্তায় দেখা হলে বলে, বেশ আছি রে তপন। ঘরে কালসাপ পুষে এতকাল অশান্তিতে জ্বলছিলুম।

তপন আধপোড়া সিগারেটটা ঘাসের দিকে ছুঁড়ে দিল। মগজের ভেতর আগুন টগবগিয়ে ফুটছে। সারাটা দিন মুখে রক্ত তুলে খাটো, সংসার সাজাও, পোষা কুকুরের মত বউয়ের পায়ে যথাসর্বস্ব ঢালো; আর সে, বেলেল্লাপনা করে বেড়াক। এর জন্যে শুধু গীতাকে নয়, ওর মা-বাবাকেও তপন মনে মনে যথেচ্ছ কটূক্তি করল। বাপ-মায়ের আসকারা না পেলে মেয়ে এতটা উদ্দণ্ড হতে পারে না। নীরদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তপনের : বউকে বেশি মাথায়তুলো না, একদিন ছোবল মাবে।— দোষটাতারই। গীতার রূপ দেখে মজেছিল। তাছাড়া, বিয়ে করতে হলে যে মেয়ের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ডটা দেখতে হয় সেদিকেও সে গুরুত্ব দেয় নি। তার ফল সে এখন হাতে-নাতে পাচ্ছে।

বাড়ি ফিরতে রাত দশটা হয়ে গেল। শীতের রাত। চারদিক নিঝুম হয়ে এসেছে। টগর খেয়েদেয়ে ছাদের চিলেকোঠায় উঠে গেছে। গীতা জেগেছিল। কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিয়ে মুচকি হেসে বলল, কি ব্যাপার, এত রাত হল যে—? গীতার গা থেকে ক্রিমের ভুরভুরে গন্ধ বেরুচ্ছিল। কটকটে লাল রঙের শাড়ি পরেছে ও। চমৎকার একটা খোঁপা বেঁধেছে। কপালে সিঁদুরের টিপটা অন্যান্য দিনের তুলনায় বড়। তপন গম্ভীর মুখে জামা ছাড়ল। ভীষণ জোরে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল তার। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, কখন ফিরলে?

হাত থেকে জহর কোটটা টেনে আলনায় রাখতে রাখতে গীতা বলল, সন্ধ্যের পরেই, সাতটা-সাড়ে সাতটা হবে।

তপন কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরল, ভবানীপুর গিয়েছিলে?

গীতা একবার গুনগুনিয়ে উঠল। তারপর সংক্ষেপে বলল, না।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে ঢুকেই তপন বলল, মশারিটা টাঙাও ভীষণ ঘুম পেয়েছে। কাল সকালেই তো আবার অফিস!

গীতা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। মশারি টাঙাতে তপন তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুলো। দুঃখে তার সমস্ত শরীর একখণ্ড বরফের মত জমে আসছিল।

আলো নিভিয়ে ভেতরে এসে লেপের তলায় ঢুকে গীতা ওর কোমরে একটা পা তুলে দিয়ে ঠাণ্ডা হাতে পিঠ ছুঁয়ে বলল, কি, ঘুমিয়ে পড়লে—

তপন নড়েচড়ে আর একটু দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে বলল, বিরক্ত করো না, ঘুম পাচ্ছে।

গীতা এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তপনেব সমস্ত শরীরে কুলকুল করে খানিকটা হাসির ঢেউ ছড়িয়ে দিয়ে বলল, ঘুম পেয়েছে না ছাই। তুমি একটা ডাঁহা মিথ্যুক।

তপন ঝটিতি পাশ ফিরল, তার মানে?

গীতা ওর নাকে বুড়ো আঙুল ঘষে ফের খিলখিলিয়ে উঠল, মিথ্যেবাদী।

তপন বলল, ভণিতা ছেড়ে আসল কথাটা বলো।

গীতা কনুই দিয়ে ওর বুকে খোঁচা মেরে বলল, কি বলব! আমি তো সোদপুর গিয়েছিলাম। তুমি বেরিয়ে যাবার পরেই সমীর এসে হাজির। ভাবলুম, রেগে-মেগে তুমি বুঝি সোদপুরে চলে গেছ।

তপন এগিয়ে গীতাকে ধরে ফেলল। বলল, তারপর—

গীতা তপনকে বুকের খাঁচায় টেনে এনে উষ্ণতা দিল। বলল, তারপর আর কি। সমীরের সঙ্গে সোদপুর চলে গেলাম। সোনাদি বলল, কই, ওর তো আসার কথা ছিল না। মাঝে মাঝে তুমি উদ্যোগ করে তপনকে নিয়ে এলেই তো পারো। ও যা বাউণ্ডুলে—। বেশ যত্ন-আত্তি করল।

গীতার ঠোঁটে গাঢ় চুমু এঁকে ওর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ধরা গলায় বলল তপন, একটা সত্যি কথা বলবে?

গীতা তখন আদর খেতে ব্যস্ত। তপনের শরীরের ভেতর নিবিড় ক'রে মিশে যেতে যেতে বলল, হ্যাঁ।

তপন বলল, আমায় তুমি ভালবাসো?

গীতা বুকের গভীর থেকে জবাব দিল, সব কথা কি মুখে বলা যায়? তুমি বুঝতে পার না?

তপন ফের বলল, আর একটা কথা—

গীতা তখন ওর শরীরের তল খুঁজছে। বলল, কি?

তপন বলল, আর জন্মে যদি আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমাকে বিয়ে করবে?

গীতা মুখ তুলে ওর ঠোঁটে হাত রাখতে গিয়ে বলল, তুমি তো আচ্ছা ছেলে মানুষ! তারপর ফের ওর বুকে মুখ লুকিয়ে ওর শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে বলল, শুধু আর জন্মে কেন তোমাকে ছাড়া আমার কোন জন্মেই চলবেই না।

## বিষয় দাম্পত্য

বাস থেকে নেমে কোণাকুণি রাস্তা পেরোবার সময়ও দপদপানিটা ছিল। কিন্তু এধারের ফুটে উঠে হল-গেটের মাথায় লটকানো 'হাউসফুল' লেখাটায় চোখ পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দিব্য।

এই রকম আশঙ্কাই সে করেছিল। কলকাতা এখন মানুষের পিঁজরা-পোল। সবাই ছটফটাচ্ছে। কেউ আর ঘরে বসে থাকতে চায়না। দিব্য একথা বিলক্ষণ জানে, শো শুরু হবার সময় হলে পৌঁছে লাইনে দাঁড়িয়ে ধীরেসুস্থে পছন্দমত টিকিট কিনে ছবি দেখা, বিশেষ করে শনি-বারের দুপুরে—সেসব কাপ্তানির দিন এই শহর থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে অনেককাল আগেই। তবু অভ্যাসবশত, প্রতিদিন ট্রাম-বাস-ট্রেন এবং বাজারে রাস্তার ভিড়ে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে চলাফেরা করতে গিয়ে সে যেমন করে তেমনি মনে মনে আরেকবার কলকাতাকে জাহান্নামে পাঠাল।

বাঁদিকের রাস্তায় দাঁড়ানো চকোলেট রঙের টয়টো গাড়িটার পেছনের সীট থেকে দুজন উঠে আসছে। প্রথমে এক ছটফটে যুবক। বয়স তিরিশ ছুঁই ছুঁই। মুখে ফরাসী ছাঁদের দাড়ি। গায়ে চক্কর বক্কর হাওয়াই শার্ট। তারপর এক তন্বী। পরনে বাহারি সিল্ক-অরগেঞ্জা। সঙ্গে ম্যাচ করা আঁটোসাটো ব্লাউজ। গলায় মঙ্গলসূত্র। দীঘল গ্রীবায় শোভা পাচ্ছে একটা পড়ো-পড়ো হাত-খোঁপা। সিঁথিতে চিকচিক করছে এক বিন্দু সিঁদুর। দুজনের চোখেমুখে একটা চাপা পরিতৃপ্তির

হাসি। সেদিকে চোখ পড়তে শিরশিরিয়ে ওঠে দিব্য। যেন আচমকা কেউ অ্যালবামের পাতা উল্টিয়ে পুরনো দিনেরএকটা ফটো মেলে ধরেছে তার সামনে। মনে পড়ে দিব্যর, বারো চোদ্দ বছর আগে শো আরম্ভ হবার মুখে তারাও এমনি ট্যাক্সি থেকে নামত। তারপর নিজের হাতের সঙ্গে দীপার একখানা হাত শেকল করে নিয়ে এমনি পরিতৃপ্ত উদাসীন ভঙ্গিতে দুধারের কৌতুহলীর দৃষ্টির ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেত হলের দিকে।

শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে দিব্য প্যাকেটটা ছুঁড়ে দেয় রাস্তার দিকে। সে সহজে দমে যাবার পাত্র নয়। ট্যাঁকে পয়সা থাকলে এখনো যে শহরটা হাতের মুঠোয় একথা তার অজানা নয়। তাই সে এবার দৃষ্টিকে ছুঁচলো করে সামনের দিকে ঘোরাতে থাকে। এবং যথারীতি দেখতে পায়, হল গেটের পুবে পোর্টিকোর নিচে ষণ্ডামত এক ছোকরা দাঁড়িয়ে। পরনে পাৎলুন, ডোরাকাটা গেঞ্জি। তেলতলে কালচে মুখে পানবসন্তের দাগ। মাথার চুল খাড়া খাড়া। থেকে থেকে বাঁশফাটা গলায় চেঁচাচ্ছে।

ভেতরের ইঞ্জিনটা ফের চালু হয়ে উঠলেও একটু সময় নেয় দিব্য। কিছু টাকা গচ্চা যাবে ভেবে নয়। এ ব্যাপারে দীপা ঠিকই বলে। আগেকার মত ফি সপ্তাহে তো নয়, ন'মাসে ছ'মাসে এক আধদিন হুট করে শেকল কেটে বেরিয়ে পড়া। অতশত হিসেব করলে চলে না। দিব্যর দ্বিধা অন্য কারণে। ছোকরার তিনদিকে চাতককুলের অস্থির ব্যূহ। বেশিরভাগই দুগ্ধপোষ্য। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে। কিন্তু ভাবে দিব্য, এছাড়া আর কি বা উপায় আছে। এর মধ্যে সে কিংবা দীপা দু-একবার অ্যাডভান্স টিকিট কাটেনি এমন নয়। কিন্তু প্রতিবারই—রাঁধুনি ঝির কামাই, বম্বে থেকে দাদার ফেরার খবর শুনে সাতসকালে বৌদির বাপের বাড়ি ছোটা, রিনি কিংবা তাতাইর হঠাৎ করে জ্বর, নৈহাটি থেকে উমনো ঝুমনো দুই শ্যালিকার আকস্মিক আবির্ভাব—একটা না একটা উটকো ঝঞ্ঝাট ঠিক তাদের প্ল্যানকে কাঁচিয়ে দিয়েছে।

মুঠোয় দুটো টিকিট। ছোকরার হাতে দুখানা দশ টাকার করকরে নোট গুঁজে দিয়ে এক দমে ভিড় ঠেলে বাঁদিকের রাস্তায় ছিটকে পড়ে দিব্য।

তারপর পার্ক-ধারের ফুটপাতে উঠে পশ্চিমে খানিকটা এগুতে সে একেবারে অন্য মানুষ। উদ্বেগ অস্বস্তি সব মুহূর্তে উবে যায়। তর সয় না তার। দাঁড়িয়ে প'ড়ে হাতের মুঠো খুলতে বেরিয়ে পড়ে দুটো কোঁচকানো টিকিট। চার-সত্তরের দুখানা গোলাপী চিরকুট। টিকিট দুটোকে সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে চালান করতেই দীপার হাসি হাসি মুখখানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সিনেমার কথায় দীপা পাগল।

পার্কের ভেতর সবুজ ঘাসে ছেলের দল ছোটাছুটি করছে। ক্রিকেটের আসর বসেছে। এদিকে রাস্তার ধার ঘেঁষে সারবন্দী দাঁড়িয়ে থাকা বকুল জারুলের শাখাপ্রশাখায় শীতশেষের দামাল হাওয়া বুরুশ চালাচ্ছে। শুকনো পাতা প্রজাপতির মত শূন্যে উড়তে উড়তে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। ঘন্টি বাজিয়ে অলস দুপুরের নৈঃশব্দ্যে মোহ ছড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে ট্রাম। দিব্যর বুকের ভেতরটা ঝলমলিয়ে ওঠে। বিজয়ীর মত সে বড় বড় পা ফেলে সামনের দিকে এগুতে থাকে।

কাল নাইট ডিউটিতে যাচ্ছিল। এলগিন রোড থেকে রসা রোডের দিকে বাঁক নেবার সময় বাসের ভেতর জানালার ধারের সীটে বসে একটা সিনেমার পোস্টার চোখে পড়ে দিব্যর। তখনই প্ল্যানটা মাথায় আসে। তারপর সকালে বাড়ি ফিরতেই সুযোগ ঘটে যায়। দীপা তখন বাথ-রুমের দরজা খুলছে। লোড-শেডিং'এর ভয়ে ভোর ভোর বাসি জলেই দীপা স্নান সেরে নেয়। ভাড়াটে বাড়ি। প্রত্যেকের নামে একখানা করে ঘর। গম্ভীর রাতে ছাড়া ঘরে বসে কোন গোপনীয় কথা বলা যায় না। রিনি এখনো এগারোয় পা দেয়নি। কিন্তু আশ্চর্য অনুমানশক্তি ওর। হাঁ করতেই পেটের কথা জেনে যায়। তারপর শুরু করে দেয় চেঁচামেচি। একালের ছেলেমেয়ে। যেমন ডেঁপো তেমনি স্বার্থপর। মা-বাবা বলে কোন ছাড়টার নেই। সব বিষয়ে ভাগ বসাবে। দিব্য সঙ্গে সঙ্গে হাত মুখ ধোয়ার অছিলায় বাথরুমের দিকে ছুটে গিয়েছিল। দীপার মুখো-মুখি ঝপ্ করে দাঁড়িয়ে পড়ে চাপা গলায় বলেছিল ঃ কি আজ সিনেমায় যাবে নাকি ?

দিব্যর কথা শুনে দীপার সাবান ঘষা মুখে রক্তিম বিদ্যুৎ চলকে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়েছিল : হুঁ, যাব। কখন?

বাবা বারান্দায়। সামনে দ্বিতীয় প্রস্থ চা। চোখ খবরের কাগজে। মা চাতালের কোণে। পায়রাদের ধান খাওয়াতে ব্যস্ত। বৌদি রান্নাঘরে। রাঁধুনি-ঝির সঙ্গে কথা বলছিল। দীপার ব্যাপারে এ বাড়ির সকলের চোখকান সজাগ। চাকুরে বউদের ঘরে বাইরে কেউ সাদাচোখে দেখে না। দিব্য স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বলেছিল : ম্যাটিনীতে।—ফিসফিসিয়ে উঠেছিল দীপা : কোথায় দাঁড়াবে?

বাবা ততক্ষণে কাগজ থেকে চোখ তুলেছেন। বৌদি রাঁধুনী-ঝির সঙ্গে কথা বন্ধ করে চোখ দুটো পাঁচ সেলের টর্চ করে বাথরুমের দিকে তাকিয়েছে। দিব্যর মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। দুই সন্তানের মা হয়ে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনকে দিন দীপার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন আরো ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। দীপাকে পাশ কাটিয়ে বাথরুমের ভেতর ঢুকে পড়ে ধমকের সুরে বলেছিল দিব্য : পার্কের কোণে। শো কিন্তু আড়াই-টেয়।

আপাতত দিব্যর দৌড় এই দেশপ্রিয় পার্ক থেকে হাজরার মোড় অব্দি। আগে তারা ভাল ছবি দেখবার জন্যে সাহেবপাড়া পর্যন্ত ছুটত। এখন সে দমও নেই বাছবিচারও নেই। পাতালরেলের খোঁড়াখুড়ির পর তাদের দৌড়ঝাঁপ আরো কমে গেছে। দিব্য এখন হাজরার ওধারেই যেতে চায় না। রাস্তার যা অবস্থা। বাড়ির কাছাকাছি বলে বেশির ভাগ সময় সে এই হলটাতেই ঢুঁ মারো। টিকিট কেটে সোজা চলে আসে এধারে। চৌরাস্তার কাছাকাছি বলে বেশির ভাগ সময় সে এই হলটাতেই দীপার জন্য বাস স্টপের লাগোয়া কৃষ্ণচূড়াগাছটার নিচে অপেক্ষা করে। কেননা খবরটা একবার কারুর মারফৎ বাড়িতে পৌঁছলে আর রক্ষে নেই। সরাসরি অবশ্য কেউ কিছু বলবে না। যৌথ পরিবারের এই এক অদ্ভুত রীতি। সব ব্যাপারে একটা রাখঢাক ভাব। কিন্তু বৌদি, পিউ, বাবা এমন কি মা পর্যন্ত মুখ থুম্বো করে থাকবে। যেন ওরা এক

ভয়ানক অপকর্ম করেছে। সেটা আরো অসহ্য।

কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছাকাছি পৌঁছে থামে না দিব্য। শো শুরু হতে এখনো কিছুটা সময় বাকি। সে সোজা এগিয়ে ল্যান্সডাউন রোড পার হয়। গিয়ে দাঁড়ায় ওধারের পানের দোকানটার সামনে, আয়নার মুখোমুখি। এক প্যাকেট দামি সিগারেট কেনে। বারকয়েক রুমালে মুখ ঘষে নেয়। হাতের তালু দিয়ে চুলের ভাঁজ ঠিক করে। সত্যি বলতে কি, এরকম লুকিয়ে চুরিয়ে সিনেমা দেখতে আসার মধ্যে একটা দারুণ রোমাঞ্চ আছে। একটা সিগারেট ধরায় দিব্য। ধোঁয়ার সঙ্গে এক টুকরো চোরা হাসি সে ছুঁড়ে দেয় আয়নার দিকে। তারপর ঘুরে ফিল্মী নায়কদের মত বেপরোয়া ভঙ্গিতে ফের রাস্তা পেরিয়ে এধারে চলে আসে।

বাঁদিকে কোণায় পার্ক-গেট ছাড়াতে পরপর ছোটছোট কয়েকটা দোকান। বেশির ভাগ বন্ধ। ডাইনে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একটা টি স্টল। তিনদিক পলিথিন শীট দিয়ে ঘেরা। ভেতরের বেঞ্চে দোকানি উপুড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। বাইরের উনুনে আঁচ দিচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে। বাসস্টপে লোক নেই। ট্রামরাস্তা খা-খা। কিছুটা দূরে পার্কের গা ঘেঁষে জবুথবু হয়ে কাঁথাকানির ভেতরে পড়ে আছে এক ভিখিরি সংসার। থেকে থেকে কাকের উদাস চিৎকার ঝিম্‌ধরা দুপুরটাকে আরো কিছুক্ষণের জন্য নিশুতি করে রাখতে চাইছে।

কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার আড়লে দাঁড়িয়ে হাতঘড়িতে চোখ ফেলে দিব্য। কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটা। দীপার স্কুল কাছেই। মনোহরপুকুরে। আজ দেড়টায় ছুটি। গড়িয়ে এলেও দশ বারো মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়।

মিনিটের কাঁটা চল্লিশের ঘরে উঠে আসতে আর স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না দিব্য। নিউজ রিল শেষ হতে চলেছে। গজগজ করতে করতে কৃষ্ণচূড়ার তলা থেকে বেরিয়ে আসে সে। দীপার এই এক মারাত্মক দোষ। প্রথমে গা-ছাড়া ভাব। শেষ সময়ে হুড়োহুড়ি। ফের ল্যান্সডাউন রোডের কাছে চলে আসে দিব্য। উত্তরদিকে মুখ করে দাঁড়ায়।

কিন্তু কোথায় দীপা। অদ্ভুত ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন। একটা লোক যে তার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছে সেদিকে খেয়াল নেই। দিব্য জানে, একটু বাদেই ঠিক দেখা যাবে দীপাকে। হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে বলবে : কতক্ষণ ?—তারপর তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই মুখ থেকে এক নাগাড়ে খই ফোঁটাতে শুরু করবে। যত সব আলতু ফালতু অজুহাত দেখাবে। দিব্য ভীষণ রেগে উঠলেও গায়ে মাখবে না। মেয়েদের এই এক আশ্চর্য শক্তি। ওরা অবলীলায় যেকোন বেচাল পুরুষকে বাগ মানাতে পারে। দীপাও ঠিক মুচকি হেসে বলবে : ক্ষমা চাইছি, এখন চলো তো, শো শুরু হয়ে গেছে।

ঘড়ির কাঁটা যেন পাগলা ঘোড়া। তিনটে বাজতে চলেছে। কপালে ভাঁজ পড়ে দিব্যর। কোনদিন তো এতটা দেরি করে না দীপা। তবে কি কোন অ্যাক্সিডেন্ট! কলকাতার যা হাল। অসম্ভব কিছুই নয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটাকে ভেতর থেকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় দিব্য : ওই তো দূরের বাঁকের মুখে মনোহরপুকুর। মাঝখানে কোথাও কোন ভিড় বা গ্যাঞ্জাম নেই। পরিষ্কার শুনশান রাস্তা। দিব্যর বুকে এবার আশঙ্কা ঘাই মারে। স্কুলে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল না তো! কাকভোর থেকে মাঝরাত অব্দি ঘরে বাইরে যা খাটুনি। কয়েক বছর আগে একবার স্কুলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল দীপা। সেবার মিস্ট্রেসরা ওকে ট্যাক্সি করে করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়।

উত্তরমুখো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দিব্য। ভাবনাটা অন্যদিকে মোচড় খায়। সেবার অসুস্থ হয়ে পড়ার একটা বিশেষ কারণ ছিল। তাতাই তখন দীপার পেটে। কিন্তু এবার। স্কুলে গিয়ে যদি দীপাকে না পাওয়া যায়। এবং তাকে দেখে যদি মুচকি হেসে দারোয়ান বলে : দীপা দিদিমণি তো ছুটি হতেই বেরিয়ে গেছেন।—তাহলে! দিব্যর হৃদপিণ্ডে রক্তের দমকা ঘা মারে। দীপা মাঝেমধ্যে দেরি করে বাড়ি ফেরে। কোন কোনদিন সন্ধ্যা উৎরে যায়। এক একদিন এক একরকম বলে। আজ হিস্ট্রীর মঞ্জু'র ছেলের মুখে-ভাত।

দলবেঁধে নিউমার্কেটে গিয়েছিলাম ডল কিনতে। কাল গিয়েছিলাম কবীর রোডে। বায়োলজির তপতী মিত্রর সদ্যকেনা ফ্ল্যাট দেখতে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সব শুনে বৌদি মুখ ভার করলেও দিব্য কিছু বলে না। ভাবে, উদয়াস্ত কাজের চাকায় বাঁধা, তারই মধ্যে সময় করে একটু আধটু খোলামেলা তো ঘুরবেই। নইলে যে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে। কিন্তু দীপার কথার কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যাকে জানে। আজকাল চারদিকে আকছার যা শোনা যাচ্ছে তাতে বিশ্বাস কথাটারই আর কোন ওজন নেই! মেজাজ শরীফ থাকলে মাঝে মাঝে রসিকতার সুরে দীপা যে তাকে ঠেস মারে না এমন নয়। বলে ঃ তুমি দিন দিন বুড়োটে মার্কা হয়ে যাচ্ছো। শুধু চিনেছে অফিস আর বাড়ি। জানো, সেজেগুজে বেরুলে এখনো আমাকে দেখে পাড়ার ছেলেদের মাথা ঘুরে যায়। কথাটা মিথ্যে নয়। শরীরে অনেক ভাঙচুর হলেও দীপার মধ্যে এখনো এমন একটা জেল্লা আছে যা এই বয়সের বাঙালি বউদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে দিব্যও ফুট কাটে ঃ তাহলে কালকেই একটা চিঠি পাঠিয়ে দাও তোমার মিহিরদাকে।—ওই একটা দুর্বল জায়গা দীপার। ওর মামিমার খুড়তুতো ভাই মিহির। রেলের চাকুরে। দীপাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। দীপারও আপত্তি ছিল না। বাধ সেধেছিল মামিমা। ক্ষেপে গিয়ে মিহির ট্রান্সফার নিয়ে চলে যায় আসানসোলে। আর বিয়ে করেনি। শুনে তেতে ওঠে দীপা ঃ এর মধ্যে আবার মিহিরদার কথা তুলছ কেন? তুমি কি ভাবো, আর বুঝি কেউ আমার প্রেমে পড়তে পারে না!

তিনটে বেজে দশ। আবার একটা সিগারেট ধরায় দিব্য। ফিরে আসে পার্কের এ ধারে। বাসস্টপে গুটিগুটি ভিড় জমতে শুরু করেছে। রাস্তায় লোকজনের চলাচল বাড়ছে। টী-স্টলের তোলা উনুনে জল ফুটছে। দূরে ফুটপাতের ওপর ভিখিরি-সংসার জেগে উঠেছে। দুপুরের ঝিমুনি ভাবটা কাটিয়ে আবার নড়েচড়ে উঠছে শহর। কৃষ্ণচূড়ার তলা থেকে ছায়া সরে গেছে। দিব্য টী-স্টলের কাছে এসে দাঁড়ায়। চায়ের অর্ডার দেয়।

## বিষয় দাম্পত্য

কোণার পার্ক-গেটের সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। পাকা ডালিমের মত ঠোঁট, ঝকঝকে মুখ। শ্যাম্পুকরা বব্‌ড চুল হাওয়ায় উড়ছে। পরনে বটলগ্রীন ফুল ভয়েলের শাড়ি। চোখে রোদ-চশমা। ফিগারটা সুন্দর। ছিপছিপে তরতাজা। অস্থিরভাবে জয়পুরী রংদার বটুয়াটা বারবার হাতবদল করছে। আর মাঝে মাঝে গলা উঁচিয়ে ট্রামরাস্তার দিকে তাকাচ্ছে।

একটু বাদে কোত্থেকে এক ছোকরা উদয় হল। কান অব্দি ঢাকা চুল। ডানহাতে ঘড়ি। পরনে চকোলেট রঙের সাফারি। খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে মেয়েটা। ছেলেটা কি যেন বলতে শরীর কাঁপিয়ে হাসতে থাকে। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকাতে জিভটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। খানিকটা চা চলকে পড়ে পাঞ্জাবিতে। একহাতে মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরে ছেলেটা পার্কের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। মনে মনে বলে ওঠে দিব্য ঃ যদ্দিন পারো ফুর্তি করে নাও। এই তো সময়। তারপর বিয়েটা হয়ে যাক। তখন বুঝবে, হুঁ, কত ধানে কত চাল।

ওধারে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। ভিখিরি স্বামী-স্ত্রী'র ঝগড়া। ট্রামরাস্তার উল্টোদিকের বাসস্টপের মাথায় বিরাট এক হোর্ডিং। ঢিলে-ঢালা পাজামা পাঞ্জাবি পরা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক সিঙ্গাপুরি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে মৌজ করে সিগারেট ফুঁকছে। দেখে দিব্যর কপালের দুপাশের রগগুলো দপদপিয়ে ওঠে। এই শহরে এমন কি কোন ব্যাটা আছে যে ওরকম নিশ্চিন্তে বসে সিগারেট টানতে পারে। যতসব বাজে অবাস্তব বিজ্ঞাপন।

পাদুটো গদার মত ভারি হয়ে উঠছে। মাজা টনটন করছে। চোখে আঁশ কাটছে। ক্ষোভে দিশেহারা দিব্য! রাতভর ডিউটি দিয়ে বাড়ি ফিরে সংসারের টুকিটাকি কাজ সেরে নাকেমুখে দুটো গুঁজে সারাটা দুপুর ফেগ্‌লু পার্টির মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা। কার জন্য। সিনেমা দেখতে আজকাল তার মোটেই ভাল লাগে না। তার ওপর আগড়ম বাগড়ম হিন্দী ছবি। তিন ঘণ্টা অন্ধকারে বসে যমযন্ত্রণা ভোগ করা। শুধু দীপার জন্য আসা।

নইলে, আজ তার ছুটি। এতক্ষণে চমৎকার একটা ঘুম দিয়ে ঝরঝরে হয়ে হয়ে উঠত সে।

দূরে ভিখিরি স্বামী বউকে চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক পিটছে। ঘড়িতে চোখ রাখে দিব্য। তিনটে পঁয়তিরিশ। হাফ-টাইম হতে চলেছে। এতক্ষণ দীপার জন্য অপেক্ষা করার কোন মানে হয়! রাগে নিজেই নিজেকে গালাগালি দিয়ে ওঠে দিব্য, শ্লা, স্ত্রৈণ কাঁহাকা!

বাড়ির রাস্তায় ঢুকতে পিউর সঙ্গে দেখা। হাতে ঢাকনায় মোড়া ঢাউস হাওয়াইন গীটার। স্কুলে যাচ্ছে। দিব্য শুধোয়, তোর কাকিমা ফিরেছে? না তো,—মাথা নাড়ে পিউ।

দিব্য সঙ্গে সঙ্গে আবাউট টার্ন। পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

তারপর কয়েক ঘণ্টা দিব্য আগলবাগল ঘোরে। খানিকক্ষণ একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রিলে শোনে। বম্বেতে রোভার্সের ফাইনাল হচ্ছে। তারপর ঢোকে চায়ের দোকানে। পরপর কয়েক কাপ চা গেলে। সেখান থেকে এক বন্ধুর বাড়িতে। তারপর পাড়ার তাসের আড্ডায়। কিন্তু মন বসাতে পারে না। কয়েক ডিল খেলে উঠে পড়ে।

বাড়ি ফিরতে প্রায় সাড়ে নটা। কপাল ভাল বলতে হবে। বৌদি পিউ রিনি পাশের বাড়িতে টি-ভি দেখতে গেছে। দাদা ফেরেনি। বাবা শুয়ে পড়েছেন। মা আর দীপা রান্নাঘরে। দীপা মাকে খেতে দিচ্ছে। দিব্য সটান ঘরে চলে আসে। খাটে তাতাই। কোলের কাছে একটা বড় পুতুল। ঘুমে বেহুঁশ। এরকম সুযোগ সহজে মেলে না। দিব্য চাষাড়ে গলায় হাঁক পাড়ে, কই, একবার শুনে যাও তো!

শাড়িটা গাছকোমর করে পরা, থমথমে চোখমুখ। রান্না ঘর থেকে ছুটে আসে দীপা। বলে, কি ব্যাপার, অসভ্যের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

দলা পাকানো টিকিট দুটো দীপার দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে দিব্য বলে, উল্টো মেজাজ! এই নাও—

ও দিয়ে আমি কি করব।—টিকিট ছুটোরদিকে ফিরেও তাকায় না দীপা। শান্ত অথচ ধারালো গলায় সে বলে ওঠে, চমৎকার!

আরো গলা চড়ায় দিব্য, গোটা দুপুরটা আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে এখন নাটক করা হচ্ছে।

বাজে বোকো না। থরথর করে কেঁপে উঠে দীপা। সমানতালে গলা চড়ায়, একহাট লোকের সামনে পার্কের কোণায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা! আজকাল কলকাতা যা হয়েছে। ছি ছি লজ্জা করে না তোমার!

দাঁড়িয়েছিলে, ভেংচে বলে দিব্য, কোথায়?

কোথায় আবার। হাজরা পার্কের ধারে।

বুকটা খসখসে হয়ে উঠলেও দিব্য পর পর কয়েকটা সিগারেট পোড়ায়। তারপর নিচে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ে। রিনি বড় হয়ে উঠবার পর এই ব্যবস্থা। দিব্য একলা নিচে শোয়।

দেয়ালের দিকে মুখ করে পাশবালিশটা কাছে টেনে নিয়ে মনে মনে কাটাকুটি খেলা খেলে দিব্য। একটা মস্ত ভুল করেছে সে। সকাল-বেলা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দীপাকে কোন পার্কের সামনে দাঁড়াতে হবে সেটা ঠিক করে বলেনি সে।

খাওয়া শেষ করে রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে ঘরে ঢোকে দীপা। জানালা দরজা দেয়। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়ায়। মুখে নাইট ক্রিম ডলে। খাটের তলা ভাল করে দেখে। ঠাকুর প্রণাম সারে। তারপর প্রতিদিনের মত আলো নেভাতে রাত প্রায় বারোটা।

দীপা মশারির ভেতর ঢুকতে দিব্য নড়েচড়ে ওঠে! দীপা বলে, একি তুমি ঘুমোওনি।

ছোট করে একটা হাই তোলে দিব্য। দীপা আধভাঙা শুয়ে পড়ে দিব্যকে দু'হাত দিয়ে টানতে থাকে। দিব্য পাশ ফেরে। দীপা দিব্যর কাছে আরো ঘন হয়ে যেতে যেতে বলে, বোকা কোথাকার! কেমন জব্দ হলে আজ। বলেছি না, সব ব্যাপারে অত হুড়োহুড়ি করতে নেই। —দীপা মাছের মত পাশে খেলা করতে থাকে। এ এক অন্য অনুভূতি। দিব্য উত্তর করে না।

## অলীক

শেষরাতের দিকে একবার ঘুমটা চটে গিয়েছিল। ঘরে আলো না জ্বললে জাগতাম না। চোখ মেলতে দেখি দরজাটা হাট করে খোলা। বারান্দার দিক থেকে তাপসীর গলার আওয়াজ ভেসে আসছিল। চাপা গলায় ও কারুর সঙ্গে কথা বলছিল। ভোরের দিকে তাপসী কখন বিছানা ছাড়ে টের পাই না। পাবার কথাও নয়। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে মস্ত বড় তক্তপোশ। আমি শুই দেয়ালের দিকে। আমার পর রবি, খোকন, যুঁই। সবার ওধারে তাপসী। বছর ঘুরতে চলল, যুঁই হবার পর থেকে, এই ব্যবস্থা।

আলোটা নেভাবে! শান্তিতে যে একটু ঘুমুবো তার জো নেই।—তাপসী ঘরে ঢুকতে মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে খরখরে গলায় বললাম। পুরনো অম্বলের রোগী। রাতের প্রথম ভাগটা এপাশ ওপাশ করি। বিনিদ্র কাটাই। শেষরাতের দিকে যা একটু ঘুম আসে। তাপসী আমাকে তিরিক্ষে হবার সুযোগ দিল না। আলোটা নিভিয়ে চটপট বাইরে বেরিয়ে গেল।

এরপর ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে। দেয়াল-ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা বাজে। আজ বাজার যাবার তাড়া নেই। মাছ আর আনাজ তরকারির দাম যে হারে বাড়ছে তাতে দু'দিনের বাজার একদিনে সারি। অন্যদিন এ সময়ের মধ্যে অবশ্য আমার দাড়ি কামানো স্নান ইত্যাদি শেষ হয়ে যায়।

হাফ ইয়ারলি ক্লোজিং সামনে। কাজের জোর চাপ, তাই কদিন হল ন-টার ভেতরেই অফিসে পৌঁছতে হচ্ছে।

ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে অবাক হলাম। তক্তপোশ থেকে নেমে দড়ি থেকে গামছাটা টেনে নিলাম। আজ আর দাড়ি কামানো হবে না। টুথব্রাশে পেস্ট লাগাচ্ছি এমন সময় তাপসীর আবির্ভাব। ভেতরে ঢুকে দেয়াল আলমারি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শুধোলাম, ছেলেমেয়েরা কোথায়? সামনেই না রবি-খোকনের টার্মিনাল পরীক্ষা?

কে জানে।—তাপসীর কণ্ঠস্বর বেসুরো ঠেকল, অতশত দেখার মত সময় নেই আমার। ঘরের কাছে একটা মানুষ মরতে চলেছে—

—মানে, লুঙ্গির কসিতে গিঁট দিতে দিতে প্রশ্ন করলাম।

মানেটানে কিছু নেই, তাপসী মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, একদিন দেখবে আমিও হঠাৎ—

আমি কিছু বলবার সুযোগ পেলাম না। তাপসী সশব্দে আলমারির ডালা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়েদের কথার হেঁয়ালি বুঝবার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু তাপসীর খোঁচাটা বুকে বিঁধল। অকৃতজ্ঞ আর কাকে বলে। যুঁই হবার পর তাপসী চারখানা হাড় হয়ে ফিরল হাসপাতাল থেকে। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখ। শরীরে একছিটে মাংস নেই। সে সময় স্পেশ্যালিস্ট দেখানো, ওষুধ-টনিক ছাড়াও প্রতিদিন দুটো করে মুরগীর ডিম আর হাফ লিটার হরিণ-ঘাটার গরুর দুধ; তাছাড়া মাঝেমাধ্যে বাজার থেকে টেংরি কিনে নিয়ে আসা—ওর জন্য সাধ্যের অতীত করেছি আমি।

ঘরের সামনে তিনদিকে ঘোরানো বারান্দা। মাঝখানে চাতাল। চাতা-লের শেষে স্নানের ঘর। মানে টিনের ঘেরাটোপ। সাতভাড়াটের বাড়িতে যেমন হয়। বারান্দায় নামতে দেখি পুতুল। পাশের ঘরের ভাড়াটের কলেজে পড়া মেয়ে। ওর কোলে যুঁই। পুতুলের কাছ থেকে আসল ব্যাপারটা বিশদভাবে জানতে পারলাম। আমার ঘরের উল্টোদিকে কর্পোরেশনের রাস্তার ওধারে হরিহর মিত্তিরের পেল্লাই তেতলা বাড়ি।

তারই এক তলার ফ্ল্যাটে থাকেন প্রবীর দত্ত। বছর দেড়েক হল এ-পাড়ায় এসেছেন। কাল শেষরাতের দিকে ভদ্রলোকের মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। হাত-পা নাকি ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ভোর ভোর পাড়ার ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। তিনি দেখেশুনে ভরসা দেননি। হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছেন। কিন্তু প্রবীরবাবুর স্ত্রী তাতে রাজি নন। পাড়ার ছেলেরা ছুটেছে বড় ডাক্তার ডাকতে।

মেজাজটা নিম্ হয়ে গেল। স্নান ঘরে চলে এলাম। সংবাদটা বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না। প্রবীরবাবু আমার চেয়ে বছরদশেকের ছোট হবেন। চমৎকার স্বাস্থ্য। এক সময় ইউনিভার্সিটি ব্লু ছিলেন। কালকেও অফিসফেরতা রাস্তার মোড়ে দেখা হয়েছে। দিব্য খোশমেজাজে বাড়ি ফিরছিলেন।

জল ঢালতে গরমেও গায়ে শীতকাঁটা দিয়ে উঠল। রাগটা গিয়ে পড়ল প্রবীরবাবুর স্ত্রীর ওপর। মেয়েদের এই এক দোষ। একবার যেটা ভাল বুঝল তার আর নড়চড় হবার জো নেই। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট, হাত-পা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে এসবই করোনারি থ্রম্বসিসের সিমটম। সাদাচোখে ভদ্রলোককে নীরোগ মনে হতে পারে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি কতটা সুস্থ তা কে জানে। তাছাড়া এ রোগ আজকাল আকছার বাচচা ছেলেদেরও হচ্ছে। এই তো মাসকয়েক আগেকার কথা। আমাদেরই অফিসের এক জুনিয়ার স্টাফ সবে চাকরিতে ঢুকেছে, বয়স মেরে কেটে বাইশ তেইশ, নাম ব্রতীন রায়, হঠাৎ দুপুরের দিকে অফিসের চেয়ারে বসেই বারকয়েক কেঁপে উঠে টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ল। তারপর, ডাক্তার ডাকার আগেই সব শেষ। ঘরে এসে রাস্তার ধারের জানালায় মুখ বাড়াতে দেখি প্রবীরবাবুর ফ্ল্যাটের সামনে ছোটখাট একটা জটলা। বেশির ভাগই পাড়ার অত্যুৎসাহী বেকার যুবকের দল। ওদের সঙ্গে রবি-খোকনও জুটেছে।

ঠিকে-ঝি কুসুম ডাকতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালাম। প্রবীরবাবু হাসিখুশি সুসামাজিক প্রতিবেশী। ওর স্ত্রীও ভালোমানুষ। খুঁই হবার

সময় তাপসী হাসপাতালে ভর্তি হলে ভদ্রমহিলা প্রায়ই ভালোটা মন্দটা রেঁধে ঝিকে দিয়ে রবি-খোকনের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। মুখে গরাস তুলতে গলায় ভাত আটকে যাচ্ছিল বারবার। একসময় বললাম, ,বুঝলে কুসুম, যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে প্রবীরবাবুর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তাই ভাবছি, আজ আর অফিসে যাব না। তুমি কি বলো ?—আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পাতে ডিমের ঝোল ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কুসুম।

হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে মুখে সুপুরির কুচি দিতে দাঁতে জোর জিভ কাটল। করোনারি অ্যাটাক হলে আর কথা নেই। বড়জোর আর ঘণ্টা-দেড়েকের মামলা। পরের দৃশ্যটার কথা ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরে যেন কেউ বড়শি বিঁধিয়ে দিল। প্রথমেই শুরু হয়ে যাবে প্রবীরবাবুর স্ত্রী আর বৃদ্ধা মায়ের বুকফাটা চিৎকার। ইদানিং কারুর দুঃখ টুঃখ দেখলে কান্না শুনলে আমি কেমন যেন ঘাবড়ে যাই। তারপর ভরদুপুরে শবানুগমন। সে আরেক বিড়ম্বনার ব্যাপার। কসবা থেকে জুন মাসের পিচগলা রোদ্দুরে কেওড়াতলা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া। তারপর, সন্ধ্যার পর আধমরা হয়ে বাড়ি ফেরা। এসব ভাবনা ঘামাচির মত চিন্তার ভেতর চিড়বিড় করে ফুটে উঠতে মুহূর্তে সিদ্ধান্তটা পাল্টে ফেললাম। আস্তে করে রাস্তাধারের জানালাটা ভেজিয়ে দিয়ে চটপট পাঞ্জাবি গায়ে গলিয়ে নিলাম। তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে চাতাল পার হয়ে খিড়কি দরজা খুলে বাড়ির পেছন দিকটার এঁদো গলিটায় এসে পড়লাম।

অফিসে পেঁাছে অপরাধবোধটা কিঞ্চিৎ লঘু হল। বুঝলাম, এসে ভালই করেছি। শিয়ালদা লাইনে ট্রেনের গণ্ডগোলের দরুণ বেশ কিছু স্টাফ আসেনি। কসবা বাসের রাস্তা। না এলে কাল সেকসন ইনচার্জের কাছে জোর ধাতানি খেতে হতো।

টিফিন অব্দি চেপে মন দিয়েই কাজকর্ম করলাম। তারপর ক্যান্টিন গিয়ে চা

আলুর দম, পাঁউরুটি খেয়ে চেয়ারে এসে বসতেই শুরু হয়ে গেল অস্বস্তি। শরীরটা আনচান করে উঠল। সেই সঙ্গে চিন্তাভাবনা সব জট পাকাতে লাগল। সাধারণ মামুলি একখানা চিঠি। সেটা টাইপ করতে বসে সাত আটটা পাতা নষ্ট করে ফেললাম। শেষে নাজেহাল হয়ে টেবিলে মাথাটা নামিয়ে দিতে পাশের চেয়ার থেকে সহকর্মী সত্যশরণ বলে উঠল, এই সুনীল, কী হল, শরীর ভালো আছে তো?

না-না তেমন কিছু না। কদিন ধরে যা গরম পড়েছে।—মুখ তুলে হেসে প্রসঙ্গটাকে হাল্কা করে দিতে চাইলেও অস্বস্তিটা ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল। শরীর খারাপ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কদিন আগে অফিসার চৌধুরীর ঘরে গিয়েছিলাম ডিকটেশন নিতে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন: ব্যাপার কি সুনীলবাবু, চোখদুটো দেখছি বেশ লাল হয়েছে, তাছাড়া মুখটাও কেমন ফ্যাকাশে! উঁহু বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে। এখন একেবারেই অবহেলা করা উচিত নয়। সরকার যখন সব খরচাখরচ দিচ্ছে, তখন সময় থাকতে ভালো করে মেডিকেল চেক-আপটা করিয়ে নিন।—কথাটা অযৌক্তিক বলেননি অফিসার চৌধুরী। কিন্তু এ-ব্যাপারে এগুতে সাহস হয় না। যদি প্রেসার অসম্ভব হাই হয়ে থাকে কিংবা রক্তে কোলেসটোরেলের ভাগ অত্যধিক বেশি থাকে। অথবা হার্টের কোন গণ্ডগোল ধরা পড়ে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে ভাল করে জল ছিটিয়ে ফিরে এলাম। তাতে আনচান ভাবটা কাটল। কিন্তু চিন্তার জট খুলল না। বরং আমার ভাবনায় একখণ্ড কালো মেঘ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। হঠাৎ যদি আমি টেঁসে যাই! গেলে তো বাঁচলাম। কিন্তু যারা থাকবে? রবি খোকন যুঁই তাপসী। ভাবতে বুকের ভেতরটা শূন্য গহ্বরের মত হয়ে গেল। প্রবীরবাবু নামকরা মার্চেন্ট অফিসের বড় মাইনের চাকুরে। ছোট্ট সংসার। স্ত্রী, একটি বছর তিনেকের ছেলে আর বৃদ্ধা মা। চাকরিতেও ঢুকেছেন অনেককাল হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কেও নিশ্চয়ই মোটা অঙ্কের টাকা জমিয়ে রেখেছেন। তাছাড়া ওঁর স্ত্রী সুশিক্ষিতা, এম-এ

পাশ। কিন্তু আমি চোখ বুঁজলে! তাপসী হায়ারসেকেণ্ডারির দরজাটাও ডিঙোতে পারেনি। একটা ইনস্যুরেন্স পর্যন্ত নেই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে অবশিষ্ট কিছু নেই বললেই চলে। থাকবেই বা কোথেকে? পরপর দু-দুটো বোনকে পার করতে হয়েছে গত পাঁচ বছরের ভেতর। আমি অকালে মরে গেলে উইডো পেন্সন বাবদ কতই বা পাবে তাপসী। স্টেনো-গ্রাফারের চাকরি। মেরেকেটে মাসে তিনশ' টাকা। তাতে এই মাগ্‌গী গণ্ডার দিনে চার-চারটে প্রাণীর পেট চালানো অসম্ভব। তায় যদি তাপসীর বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল হত। মা-ষষ্ঠির কৃপায় শ্বশুরমশাইর সাতটি ছেলেমেয়ে। তার আবার প্রায় সব কটাই অপোগণ্ড।

ছুটির মুখে এক পশলা জলঝড় হয়ে গেল। ফলে অফিস থেকে বেরুতেই সাড়ে ছটা। তারপর বৃষ্টিবন্দী মানুষের ভিড় ঠেলে বাসে ওঠা, সে কি প্রাণান্তকর কষ্ট। ঘণ্টাখানেক বাদে নির্দিষ্ট স্টপে নেমে বাড়িমুখো এগুতে গিয়ে একসময় দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম, রাত প্রায় আটটা বাজতে চলেছে, প্রবীরবাবুর দাহকাজ সেরে শ্মশানযাত্রীদের হিসেবমত এই সময়েই ফিরে আসার কথা। তার মানে বাড়ির রাস্তায় ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ষোলআনা সম্ভাবনা। তাহলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না। সকালের দিকে সকলের অজ্ঞাতে স্বার্থপরের মত পালিয়ে এসেছি। কেউ কিছু বললে কী জবাব দেব।

অগত্যা কাছাকাছি একটা পার্কে ঢুকে পড়লাম। উদ্দেশ্য, একটু রাত করে পাড়া নিশুতি হলে বাড়ি ফেরা। ছোট পার্ক। দেখেশুনে ফাঁকা একটা সীট দখল করলাম। বেজায় তেষ্টা পাচ্ছিল। শুকনো গলাটাকে চাঙা করার জন্য একটা সিগারেট ধরলাম। হঠাৎ সামনের দিকে চোখ পড়তে দেখি অদূরে আমার মুখোমুখি এক সীটে এক ছোকরা একটি মেয়েকে নিয়ে বসে আছে। ওদের মাঝখানে শুধু পেছনের ল্যাম্পপোস্ট থেকে নেমে আসা সরু একফালি আলোর ব্যবধান। ওরা ফিসফিস করে কথা বলছিল। ছেলেটার একটা হাত মেয়েটির কাঁধের ওপর। একসময় মধ্যবর্তী সরু আলোর ব্যবধানটুকু মুছে যেতে দুজনকে আর

আলাদা করে চেনা গেল না। মাথার ভেতর রক্ত চলকে উঠল। আমি ওদের মুখোমুখি সীটে বসে। মাঝখানে শুধু এক চিলতে ঘাস-জমি। দেশটা কি রাতারাতি ইউরোপ আমেরিকা হয়ে গেল!

নির্জন এঁদো গলিপথ ধরে বাড়ির খিড়কি দরজার কাছে এসে আস্তে করে কড়া নাড়লাম। একটু বাদেই বারান্দার আলোটা জ্বলে উঠল। তাপসী এসে দরজা খুলল। ওর থমথমে মুখের দিকে তাকাবার মত সাহস নেই আমার। আর সব ভাড়াটেদের ঘরের আলো নিভে গেছে কখন। ব্যঙ্গের সুরে বলল তাপসী, এত রাতে কোন্ রাজ্য জয় করে ফেরা হল?

না মানে—, বানিয়ে বলতে গিয়ে কথাটা জড়িয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ অফিসে কাজের চাপ পড়ায়—

কিছুক্ষণ পর আমার দিকে ভাতের থালাটা এগিয়ে দিয়ে বড় একটা হাই ছাড়ল তাপসী। বলল, যাক এতক্ষণে ভদ্রলোক নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছেন।

কে?—বিষম খেলাম আমি।

কে আবার, প্রবীরবাবু।

রান্নাঘরে কালিঝুলি মাখা কম পাওয়ারের আলোয় আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না।

খাওয়ার মাঝখানেই তাপসী আমার সারাটা দিনের উত্তেজনা জল করে দিল। জানাল, বেলা দশটা নাগাদ বড় ডাক্তার আসেন। ভালো করে পরীক্ষা করে তিনি বলেন, ভয় পাবার মত কিছু হয়নি প্রবীরবাবুর। দারুণ গরমে মাথায় সর্দি বসে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে বদহজমজনিত বায়ুর চাপে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। ওষুধ ছাড়া পরপর কয়েকটা ইঞ্জেকশনও দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে ছটফটানি কমের দিকে। কিছুক্ষণ হল অঘোরে ঘুমুচ্ছেন ভদ্রলোক।

আরো কিছুক্ষণ বাদে তক্তপোশে উঠে দেয়ালের দিকে গিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। পাশে ছেলেমেয়েরা ঘুমে কাদা। তাপসীর বিছানায় আসতে এখনো অনেক দেরি। এই সময় কিছুক্ষণের জন্যে ওর কাঁধে

ভূত চাপে। রান্নাঘর থেকে এঁটো বাসনগুলো টেনে এনে ঘরের এক কোণে জড়ো করে। কি গ্রীষ্ম কি শীত সব ঋতুতেই জানালাগুলো বন্ধ করা চাই। খিল ছিটকিনি লাগাবার পর গোল টেবিলটা টেনে নিয়ে গিয়ে দরজার সামনে রাখে। বারবার বসে নিচু হয়ে তক্তপোশের তলা দেখে। এ নিয়ে বলে বলে আমি হন্যে হয়ে গেছি। কি এমন মূল্যবান বস্তু ঘরে আছে যে এত সতর্কতা। আমারকথায় কর্ণপাত করে না তাপসী। আজ কিন্তু সমস্ত গ্লানি আর ক্লান্তি মুছে গিয়ে শরীরটা ভীষণ হাল্কা লাগছে। বিন্দুমাত্র অস্বস্তি নেই। বরং সুখাবেশে জড়িয়ে আসছে চোখের পাতা। বুঝতে পারছি, রাতে ভাল ঘুম হবে আমার।

একটু বাদে জেগে উঠলাম। চারদিকে অন্ধকার। টের পেলাম তাপসীর একটা হাত আমার বুকের কাছে নেমে এসেছে। ও নিজের পা দিয়ে আমার পা ঘসছে। ও কখন আলো নিভিয়ে চোরের মত যূঁই খোকন রবিকে ডিঙিয়ে আমার কাছে চলে এসেছে জানিনা। অনেকদিন বাদে তাপসী আমার কাছে! পাশ ফিরলাম। তাপসী আমার আরো কাছে এল। আমি ওর ছোটখাট শরীরটার পুরানো ঘ্রাণ অনুভব করছি।

তাপসী আমার বুকের মধ্যে মিশে যাবার আগে বড় করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে যে কথাটা আমি বলতে চাইছিলাম অবিকল সেই কথাটা বলে উঠল ফিসফিসিয়ে, সত্যি আজ দিনটা যা ভয়ে ভয়ে কেটেছে।

## রাজা

'আরো কয়েকটা দিন আছিস তো ?'—গলির মুখে নেমে পড়ে শেষ বারের মত প্রশ্ন করে সনৎ। কথায় সামান্য জড়তা থাকলেও শ্লেষ্মার টান কেটে গিয়ে এখন তার গলাটা বেশ ভরাট।

প্রবীর জানালার কাছে এগিয়ে আসে। ও যাবে যোধপুর পার্কে। উঠেছে এক দূর সম্পর্কের দাদার বাড়িতে। ঘামে চকচকে মুখ। চুলের কেয়ারি আধখানা ভেঙে কপালে নেমেছে। ঝিমন্ত হাসে, 'না, কালকের রাজধানী-তেই ফিরে যাচ্ছি—, প্রবীরের কথা শেষ হয় না। ট্যাকসি স্টার্ট নেয়। তারপর রাতের জনহীনতায় উদাস হারিয়ে যায় বাঁকের আড়ালে।

বাঁ ধারে সরু গলি। মুখোমুখি দুজন হাঁটা দায়। এই গলির একেবারে শেষে সনতের বাসা। ল্যাম্পপোস্টের বাতি উধাও। এবাড়ি সেবাড়ির ফাঁকফোকর থেকে যেটুকু আলোর টুকরো-টাকরা ছিটকে বেরিয়ে আসছে তাতে আরো ভুতুড়ে লাগছে গলিটাকে। ভেতরে ঢুকতে মেজাজটা টক হয়ে ওঠে সনতের।

অথচ এমনটা হবার কথা নয়। এখনো তার সারা শরীরে একটা ফুর্তির ভাব খেলা করে বেড়াচ্ছে। মনটা উড়ুউড়ু। কানের পর্দায় চলকাচ্ছে রক্ত-পাগল করা বাজনার গমক। চোখের সামনে এক অন্য জগতের ছবি। বিরাট হলঘর। তার একদিকে কাঠের উঁচু পাটাতন। সেখানে লাল নীল হলদে বেগুনী নানা রঙের তীব্র আলোর ঝলক তাড়া করে ফিরছে এক মায়াবী সুন্দরীকে। বাদবাকি অংশ পুরু কার্পেটে মোড়া। এক

একটা টেবিলকে ঘিরে কয়েকটা গদীআঁটা চেয়ার। তাতে একগুচ্ছ করে মানুষ।

পায়ের স্টেপগুলো বাগে আনা যাচ্ছে না। কেবলই ছোট বড় হয়ে যাচ্ছে। মাথাটা থেকে থেকে সামনের দিকে ঝুলে পড়ছে। ঢলঢলে জামা পরলে যেমনটা হয় শরীরটা ঠিক তেমনি লগবগে লাগছে। দু'ধারে অন্ধকারের দেয়াল। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু সনতের এই জ্ঞানটুকু টনটনে আছে যে, বে-খেয়ালে পা হড়কে গেলে কিংবা পাশের দেয়ালে ধাক্কা লাগলে একটা ছোটখাট বিপদ ঘটে যেতে পারে।

প্রবীর তাকে পাকড়াও করে কার্জন পার্কে ঢোকার মুখে। সন্ধ্যার কিছু আগে। একটা বড় হার্ডওয়ারের দোকানে হিসেবের খাতা-পত্র দেখে সনৎ। অফিস ফেরত ছুটছিল ট্রামগুমটির দিকে। হঠাৎ কোত্থেকে প্রবীরের আবির্ভাব। একেবারে সামনে পড়ে গিয়েছিল। প্রবীর চোখ ছুঁচলো করে বলেছিল, 'সনৎ না?'

'হ্যাঁ'—পরনে দামি কর্ডের প্যাণ্ট, হালফ্যাসানের স্পানটেরিকটের বুশশার্ট, বাহারি ষ্ট্রাইপের টাই, একমাথা পাটকরা ঝকঝকে চুল, চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা—আগাপাশতলা উজ্জ্বল প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বোকার মত মাথা নেড়েছিল সনৎ।

'কিরে চিনতে পারলি না তো! আমি কিন্তু তোকে দূর থেকেই—', বলতে বলতে প্রবীর গোঁফের কোণা থেকে রহস্যের ঝিলিক ছোটাতে দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল সনতের, 'প্রবীর, তুই! এতদিন কোথায় ছিলি?'

ষাট সালের পর এই দেখা। কলেজে একই ক্লাসে পড়েছে টানা প্রায় চার বছর। দুজনেই ছিল তুখোড় অ্যাথলেট। সেই সুবাদে হরিহর-আত্মা! ফাইনাল স্পোর্টসের প্রাইজগুলো বলতে গেলে সব ওরাই ভাগাভাগি করে নিত।

'ইটস্ এ লং স্টোরি।'—পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে

সনতের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলছিল প্রবীর, 'তুই তো ফ্যামিলি ট্রাবলস'এ পড়ে টেস্ট পরীক্ষার আগেই কলেজ ছাড়লি। আর আমি, বি-কম কমপ্লিট করে জব ভাউচার জোগাড় করে লণ্ডনে চলে গেলাম। সেখানে ছিলাম বছরদশেক। তারপর হোমে ফিরে ব্যাঙালোর চণ্ডীগড় বম্বে···। এখন দিল্লীতে। কলকাতায় এসেছিলাম জোনাল অফিসের একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে।'

পুরনো কলেজের বন্ধু। আনন্দে উষ্ণ হয়ে ওঠার আগেই রাজভবনের দিকে চোখ পড়তে দমে গিয়েছিল সনৎ। সেদিক থেকে একখণ্ড বিশাল ভালুকে মেঘ উপরের দিকে উঠে আসছিল। ক'দিন হল পেটেব ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছে সীতা। মাসের শেষ। ঝটপট পাড়ায় পৌঁছে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ধরতে হবে। বৃষ্টি নামলে কেলেঙ্কারির একশেষ। বুড়ো ডাক্তার সাড়ে সাতটার মধ্যে ডিস্পেন্সারির ঝাঁপ বন্ধ করে চলে যায়। তারপর বাড়ি ফিরে ঝুমাকে নিয়ে বসা। ওর হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা চলছে। কাল অঙ্ক। অঙ্কে একদম মাথা নেই মেয়েটার। কিভাবে প্রবীরকে কাটান দেবে বুঝতে না পেরে সনৎ ঘন ঘন বিলিতি সিগারেটে টান দিচ্ছিল।

'তারপর কেমন আছিস বল?'—দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা সহজ করে নিয়ে প্রশ্ন করল প্রবীর।

'ভালই।'—মেঘটা মাথার ওপর উঠে আসতে ম্লান স্বরে উত্তর করেছিল সনৎ।

'বিয়েটিয়ে নিশ্চয়ই করেছিস?'

'অনেকদিন, সিক্সটি ফাইভে।'

'বাচ্চাকাচ্চা ক'টা?'

'তিন'।—ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করলে অর্ধমনস্ক সনৎ পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, 'তুই করিসনি?'

'না।'—আত্মপ্রসাদের হাসি হেসেছিল প্রবীর, 'আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু বি এ বণ্ডেড লেবার। তোফা আছি।'

হঠাৎ দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি গায়ে পড়তেই মরিয়া হয়ে উঠেছিল সনৎ। চোখেমুখে উদ্বেগের ভাব ফুটিয়ে বলেছিল, আমার' একটু তাড়া আছে। কাল চলে আয় না আমার অফিসে। এই তো, তেরোর দুই বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট'।
'হোয়াটস্!'—তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল প্রবীর, 'কতদিন বাদে দেখা। এখন তোকে ছাড়ছে কে। চল্ আমার সঙ্গে!'
'কোথায়?'—অসহায় সনৎ প্রশ্ন করেছিল।
'আজ আমি যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যেতে হবে তোকে!'—কুড়ি বছর আগেকার মতই আদেশের ভঙ্গিতে বলেছিল প্রবীর।
'কে?'—চাষাড়ে গলার আওয়াজে ঘোরটা ফিকে হয়ে এল। অন্ধকারে আওয়াজটা কোনদিক থেকে আসছে বোঝা গেল না। সনৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আমি'।
'আমিটা কে?'
'আমি ঝুমার বাবা।'
'সনৎবাবু নাকি! এত রাতে কোত্থেকে?' —এবার গলার স্বর অনেক মিহি।
তা জেনে তোর দরকারটা কি রে শালা। মনে মনে বলে মুখ ভেংচাল সনৎ। বলল নরম গলায়, 'একটা নেমতন্ন ছিল—।'

মান্ধাতার আমলের এই সাত ভাড়াটের বাড়িতে অসুবিধা অনেক। তবু মানিয়ে চলতে হয় সীতাকে। কালীঘাটের মত জায়গা। ট্রামবাস ইস্কুলবাজার সব হাতের কাছে। ঘর একখানা হলেও মস্ত বড়। পেছনে লাগোয়া ছাদ। ভাড়া নামমাত্র। পুবের ঘরটা শিবু হাজরার। এতক্ষণ ওধারে গাকগাক শব্দে ফিল্মী গান বাজছিল। লোকটা বেরোয় কাক-ভোরে। ফ্যাক্টরির কাজ। ওভারটাইম সেরে বাড়ি ফিরতে রাত হয়। তারপর খাওয়া সেরে ট্রানজিস্টার খোলে। অন্যদিন হলে আলো নিভিয়ে অম্বলের রুগী সীতা বাপির পাশে শুয়ে শিবু হাজরার মুণ্ডুপাত করত। আজ অবশ্য বিরক্ত হচ্ছিল না। বরং বাপি মিতা এমনকি ঝুমাও বাবার

জন্য অপেক্ষা করে করে ঘুমিয়ে পড়েছে। সংসারের টুকিটাকি কাজও সব শেষ। রেডিও চলায় যাহোক সময়টা কেটে যাচ্ছিল। গান থেমে চারদিক নিশুতি হয়ে পড়লে সাতপাঁচ দুর্ভাবনায় বায়ু চড়তে লাগল সীতার।

কড়া নাড়ার সুযোগ দেয় না সীতা। দুদ্দাড় শব্দে সনৎ তোতলায় উঠে আসতেই দরজার একটা পাল্লা খুলে দাঁড়ায় সে। সনতকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে খরখরে গলায় বলে ওঠে সীতা, 'এত রাত হল যে!'

কষটে চোখে সনৎ একবার তাকায় সামনের দিকে। মেঝেয় পাতা টানা বিছানায় পরপর শুয়ে আছে ছেলেমেয়েরা। একশ পাওয়ারের আলো জ্বলছে। তবু ঘরটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার। শুকনো জিভের ডগা ঠোঁটে ভিজিয়ে নিয়ে নাটুকে গলায় জবাব দেয় সনৎ, 'সবদিন তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে এমন কি কোনো কথা আছে?'

'তাই বলে এতরাত!'—ফুঁসে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয় সীতা। পশ্চিমের ঘরে রেলের রিটায়ার্ড চাকুরে যতীন দত্ত থাকে। সেদিক থেকে খটখটে কাশির শব্দ ওঠে। গত সনে বউ মারা যাবার পর বুড়োর রাতে ঘুম নেই। সীতা দমচাপা গলায় বলে, 'ঠিক আছে। জামা-কাপড় ছেড়ে রান্নাঘরে চলে এসো। ভাত বাড়ছি।'

'আমি খাব না।'—দেয়ালে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চায় সনৎ।

'কেন?'

'কেন আবার। খেয়ে এসেছি তাই,'—ভুরু নাচিয়ে বলে সনৎ, 'ফিস-রোল, নানরুটি, চিকেন কারি—অনেক কিছু।'

'একি, জামাটা দেখছি একেবারে নষ্ট করে ফেলেছো!—সনতের পাঞ্জাবির অনেকটা অংশ জুড়ে ঝোলের দাগ। সেদিকে নজর পড়তে চোখ বড় করে সীতা, বলে, 'আজকেই তো ভাঙলে। আরেকটা সবে সোডায় ফুটিয়েছি। কাল অফিসে যাবে কি পরে?'

'গুলি মারো অফিসের।'—সীতাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে সনতের চোখে হাইপাওয়ারের লাল নীল হলদে বেগুনী আলো জ্বলে উঠতে থাকে। দেয়াল ছেড়ে সে খপ্ করে সীতার একটা হাত ধরে

ফেলে।

'আঃ, কি হচ্ছে—।—ধমকে ওঠে সীতা। ততক্ষণে সনৎ আরেক হাতে সীতার কোমর জড়িয়ে ধরেছে। তার রক্তে তখন শুরু হয়ে গেছে খ্যাপামির মাতন। গাঢ়স্বরে বলে সনৎ, প্লিজ সীতা। এসো, আমরা দুজনে আজ একটু ড্যান্স করি।'—সনৎ কাছে টানতে বিশ্রী গা-গোলানো ভকভকে গন্ধে শিউরে ওঠে সীতা। তার হাড়পাঁজর কাঁপিয়ে কয়েকটা শব্দ ছিটকে বেরিয়ে আসে কণ্ঠনালী থেকে, 'একি, তোমার গায়ে এ কিসের গন্ধ!'

'ও কিছু না,' ভারি চোখের পাতা টেনে হাসে সনৎ। তারপর ত্রিভঙ্গ হয়ে দোলাতে চায় সীতাকে। বলে আবেগ জড়ানো গলায়, সী ইজ এ ক্রেজি ফুল ও, ড্যাডি ড্যাডি কুল···।'

ঝুমা ঘাই মেরে পাশ ফেরে। তবে কি ও জেগে গেল। ভয় সংকোচ কান্না সব একসঙ্গে মিশে বিহ্বল করে তোলে সীতাকে। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না সে। শুধু কাটা রেকর্ডের মত বেসুরো আউড়ে চলে, 'ছাড়ো; ছাড়ো বলছি···।'

হঠাৎ সনতের চোখেমুখে বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে। মাঝপথে তাল কেটে গেলে যেমন হয়। সে সীতাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলে। ঘরের কোণ থেকে একটা মাদুর টেনে নেয়। তারপর দুর্বোধ্য গলায় কি সব যেন বলতে বলতে সশব্দে পেছনের দরজা খুলে টলতে টলতে চলে যায় ছাদের দিকে।

রান্নাঘর মানে সামনের বারান্দার খামচিতে দরমা-চটার ঘেরাটোপ। আলো জ্বালতে আরশোলাদের ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। ঘাম ঘাম ভাত। পেঁপে সেদ্ধ ঝিঙে-পোস্ত আর আলু পটলের ঝোল। সব চটকে নিয়ে মুখে তোলে সীতা। গলা দিয়ে নামতে চায় না। ফিক্ ব্যথার মত একটা ভয় বুকের ভেতর অনবরত দাপাচ্ছে। আজ এত বছর হয়ে গেল মানুষটার সঙ্গে ঘর করছে। কোনদিন এমন বেচাল হতে দেখেনি সে। নিচের তলার ভাড়াটে অমরবাবুর হাল সে স্বচক্ষে দেখেছে। দিব্যি

ভালোমানুষ। হঠাৎ মদের নেশায় ধরল। তারপর জুয়া, রেস। চাকরিটা খোয়ালেন। এখন সকাল থেকে দোরগোড়ায় পাওনাদারদের চেল্লাচেল্লি। বাচ্চাগুলোর দুবেলা ভাত জোটেনা। সীতার কপালের দুপাশের রগগুলো দপদপিয়ে ওঠে। আগুন ছোটে মাথার ভেতর। শুরুতেই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। নইলে···। পাতে জল ঢেলে উঠে পড়ে সে।

ঝোড়ো হাওয়া আর কয়েকপশলা বৃষ্টি আকাশটাকে ঝাটপাট দিয়ে চলে গেছে কখন। ত্রয়োদশীর চাঁদ বাড়িঘরের জঙ্গল টপকে মাথার ওপর উঠে এসেছে। ঝিরঝিরে সজল হাওয়া বইছে। হাল্কা নীলের সঙ্গে চলেছে জ্যোৎস্নার লুকোচুরি খেলা। ভেজা হাত শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে ছাদে চলে আসে সীতা।

সনতের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সীতা। টানটান চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মানুষটা। এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির ঝিলিক। মুখটা অনেক ভেঙেচুরে গেলেও এখনো নাকটা টিকোলো, চিবুক তীক্ষ্ণ। চওড়া কাঁধ, লোমশ বুক। গভীর রাতের রূপোলি নিঃশব্দে ওর সারা শরীর ধুইয়ে দিচ্ছে।

কাঁপতে থাকে সীতা। বুকের ভেতর থেকে একটা থরথরানি উঠে এসে পাঁজর ভেদ করে কাঁপতে থাকে। পনের যোল বছরের ঝুলকালিতে বিবর্ণ সংসারের অন্ধকারে হঠাৎ আলোর ঝলকানি। মনে পড়ে যায় সীতার সেদিনের কথা। সেদিন মা-বাপমরা মামাবাড়ির অনাদর অবজ্ঞার গ্লানি থেকে তাকে সনৎ সবেগে টেনে বের করে নিয়ে এসেছিল। স্পষ্ট, ভারি গলায় তার বড়মামাকে সকলের সামনে বলেছিল সনৎ : এখন থেকে সীতা আমার। আমি আজই ওকে রিজেস্ট্রি করব। আপনাদের আর ওর ভার বইতে হবে না।

হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ে সীতা। একখানা ঘর। সাত ভাড়াটের বাড়ি। দেয়ালেরও কান আছে। তিন ছেলেমেয়ে আর আছে। অভাব রোগ দুর্ভাবনা। এখন গভীর রাত। তাদের কাছে রাত মানেই অবসন্নতা,

ঘুম, অন্ধকার।

চোখের পলক পড়ছে না সীতার। হঠাৎ সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। পলকা শরীরটায় থেকে থেকে শিহরণ জাগে। অণুপরমাণুর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে। খোলা আকাশের নিচে চাঁদের আলোয় সে মানুষটাকে দেখে। নতুন করে ঘুমের ভেতর ঘরের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে মাকে পাশ ফিরে কাছে না পেয়ে কাঁদছে বাপি। সীতা ভ্রূক্ষেপহীন। তার সারা শরীরে বিদ্যুতের ঝিলিক। সেই পুরনো দিনের মত। সনতের পাশে বসে পড়ে সীতা। ঝুঁকে ডাকে, 'এই, এই শুনছ—'

কথাটা হাসি হয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে সনতের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে সীতা।

## খুনী

কুয়োতলা থেকে ঘরে ফিরে আসতে বিপিন দেখল, শেফালী মেঝেয় কালকুজো মেরে পড়ে আছে। পা দুটো গোটানো, হাঁটু অবধি নিরাবরণ। মাথা বুকের দিকে ঝুঁকে আসায় মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ডানহাত তলপেট ছুঁয়ে মেঝেয় নেমে গেছে। আঁচলের এক ফালি অংশ পিঠের পাশে লুটোচ্ছে। বিপিন আয়নার কাছে এসে গামছাটা বারকয়েক গলায় বুকে ঘষে নিল। তারপর কিছুক্ষণ চুলের ভেতর এলোপাথাড়ি চিরুনি চালাল। একসময় আয়নার দিকে মুখ রেখেই গম্ভীর গলায় বলল, কি ব্যাপার, উঠবে না?

শেফালীর ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চেঁচিয়ে কথা বলার মত দমটুকু আর বিপিনের নেই। সারাটা দিন পেটে ভারি কিছু নামে নি। পেটে বাচ্চা আসবার পর থেকে, বিপিন লক্ষ করছে, দিন দিন শেফালী কি রকম মারমুখী হয়ে উঠছে। সকালে, দোকানে বেরুবার মুখে, শেফালী অযথা একটা ঝগড়া পাকিয়ে তুলতে চেয়েছিল। বিপিন উচ্চবাচ্য করেনি। গায়ে জামা চড়িয়ে শান্তমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। দুপুরে বাড়ি ফেরেনি। ফেরার ইচ্ছেও হয়নি। গোপালকে দিয়ে মিষ্টির দোকান থেকে গরম দুধ আনিয়ে খেয়ে নিয়েছিল।

হাত বাড়িয়ে দেয়ালের খোপে চিরুনিটা রেখে মস্ত একটা হাই তুলতে

বিপিন নিস্তেজ হয়ে এল। সে ক্লান্ত স্বরে বলল, বিছানাটা পেতে দেবে? ঘুম পেয়েছে—।—ওদিকে তখনো কোন সাড়াশব্দ নেই। বিপিন বুঝল, শেফালী ফুঁসছে। এখন ওকে আদর করে ভালবেসে সহজ করে তুলতে সময় লাগবে। সে মনে মনে হাসল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। শেফালীর কাছে এগিয়ে এসে হাঁটুমুড়ে বসল। নরম করে ডাকল, শেফালী—। —বিপিনের এই দোষ। মাথায় রক্ত চড়লে আর মানুষ থাকে না। লাথিটা তলপেটে পড়েছিল। আসলে তখন সে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। নিজের শরীরের ওপর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। লাথিটা যে অত অব্যর্থ হবে, ঠিক বুঝতে পারেনি সে।

এবার বিপিন নিচু হয়ে শেফালীকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি দুই হাতে ওকে চিৎ করে ফেলতে সে চাপা আর্তনাদ করে উঠল। আলোয় শেফালীর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুচোখের মণি ওপরের পাতায় স্থির জমে আছে। নিচু থেকে সাদা অংশ পাথরের গুলির মত ঠেলে উঠেছে। ঠোঁটের কোনায় লালচে রঙের বুদবুদ জমেছে। দুই ভ্রু জোড়া লেগে কপালে কতগুলো ভাঁজ পড়েছে। হাতের আঙুল-গুলো কি রকম বাঁকানো, ও যেন কিছু আঁচড়াতে চেয়েছিল। বিপিনের বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। আট মাসের পোয়াতি। হঠাৎ লাথিটা পড়তে—

বিপিন শেফালীর গলায় হাত রাখল। কোন স্পন্দন অনুভব করল না। কপাল, হাতের চেটো, আঙুলের ডগা স্পর্শ করতে উষ্ণতা পেল না। পায়ের ডিম দুটো, শিরায় টান ধরলে যেমন হয়, শক্ত। বিপিন সবেগে ডান হাতটা ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে টিপ বোতামগুলো পটাপট খুলে গেল। বুকের দিকটাও শক্ত, বুঝি বা শেফালী দম বন্ধ করে আছে। বিপিন এবার সরে এসে আরো নিচু হয়ে ওর তলপেটে কান রাখল। কোন শব্দ শুনতে পেল না।

দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার সময় বিপিন শরীরে কোন জোর পেল না। সে টলে টলে যাচ্ছিল। আলোর দিকে চোখ পড়তে তার মনে হল,

কেউ তাকে এইমাত্র গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে। তারপর, প্রথমেই তার খেয়াল হল, পেছনের দরজাটা খোলা। সে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। দরজার ওপাশে উঠোন, উঠোনের প্রান্তে কুয়ো। এক পাশে পায়খানা। কুয়োর পিছনে কলাগাছের ঝোপ। তার ওপাশে নিচু জলো জমি, রেল-লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মুহূর্তে কিছুই বিপিনের চোখে পড়ল না। দরজার ফ্রেমে শুধুই শব্দহীন অন্ধকার। বিপিন এগিয়ে গিয়ে কপাট ভেজিয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।

পশ্চিমের জানালা বন্ধ করার আগে লোহার শিকে মাথা ঠেকিয়ে বিপিন কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। জানালার গা ঘেঁষে দু-দুটো নিমগাছ। তার ওপাশে এক চিলতে বাগান। তারপর পুরনো ধাঁচের একটা দোতলা বাড়ি। বাড়িঅলা থাকে। কোনো ঘরে আলো জ্বলছিল। বিপিন বুঝল, সুধীর এখনো ফেরেনি। বাড়িওলার মেজ ছেলে সুধীর। বিপিন ঘুরে দাঁড়াল। শেফালী নিঃসাড় পড়ে আছে। দুই হাঁটু ঈষৎ ভাঁজ করা বলে পেটটা ভারি বোধ হচ্ছে না। বিপিন নিজের লোমশ বুকে হাত ঘষতে লাগল। এই মুহূর্তে কি করা যেতে পারে ভেবে উঠতে না পেরে সে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। শেফালীকে লাথি মারার পর কি কি ঘটেছিল, ভাবতে চেষ্টা করল। লাথিটা খেয়ে শেফালী ঘুরে গিয়ে দেয়াল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল। বিপিন ততক্ষণে দড়ি থেকে গামছা টেনে নিয়ে কাঁধে চাপিয়েছে। তারপর ওকে বেমালুম উপেক্ষা করে পেছনের দরজা খুলে তাড়াতাড়ি উঠোনে নেমে পড়েছিল। এমনকি বাইরের আলোটা জ্বালাবার সময়টুকু খরচ করেনি। উঠোনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে কিছুটা সময় পায়চারি করেছে। ঘরের ভেতর শেফালী কি তখন কাতরাচ্ছিল ? বিপিন জানে না। কেননা, তখন তার মাথায় আগুন ছুটছে। কুয়োতলায় এসে অনেকক্ষণ ধরে চোখেমুখে জল ছিটিয়েছিল। একমুখ জল নিয়ে শব্দ করে গলা পরিষ্কার করেছিল। মুখ ধোয়া হলে কলাগাছের ঝোপের দিকে সে অর্থহীন তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। আসলে সে কিছুটা সময় নষ্ট করতে চেয়েছিল। যাতে শেফালীর

রাগটা পড়ে আসে। তারপর, ঘরে এসে আয়নায় মুখ রেখে চুল আঁচড়ানো পর্যন্ত একথা কখনো তার মনে হয়নি, সামান্য একটা লাথিতে পেটের বাচ্চা সমেত নাড়িভুঁড়ি দলা পাকিয়ে মাখামাখি হয়ে শেফালীর শ্বাসযন্ত্র বিকল হয়ে যাবে। বিপিন ভাবতে চেষ্টা করল, শেফালী কখন দুই হাতের দশ আঙুল দিয়ে তলপেট চেপে ধরে শেষবারের মত আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। যখন সে উঠোনে পায়চারি করছে—না, কুয়োতলায় ? অথবা ঘরে, চুল আঁচড়াচ্ছিল ?

বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে ভেজা ভেজা কপাল মুছে নিতে বিপিনের তেষ্টা পেয়ে গেল। রান্নাঘর বড়ঘরের লাগোয়া। রান্নাঘরে ঢুকে বেশ কিছু-ক্ষণ হাতড়াবার পর সুইচটা পাওয়া গেল। আলো জ্বলে উঠতে বিপিন দেখল, বালতি-উনুনের মুখে পরিপাটি করে কয়লা সাজানো। হাড়ি কড়াই কাঠের তাক থেকে নিচে নামানো হয়েছে। শিলনোড়ার পাশে মশলার কৌটো। বোঝা গেল, শেফালী একবার রান্নার তোড়জোড় করেছিল। এবং এ কথা মনে হতেই দোকান থেকে ফিরবার পরের সমস্ত ব্যাপারটা বিপিনের চোখের সামনে ছায়াছবির মত ভেসে উঠতে লাগল। দোরগোড়ায় এসে সিঁড়ির ধাপে এক পা রেখে সে অনেকক্ষণ ধরে কড়া নেড়েছিল। আর তখনই তার মাথায় একটু একটু করে রক্ত চড়তে শুরু করেছে। শেফালী দরজা খুলতে বিপিন বলেছিল, কি ব্যাপার,ঘর অন্ধকার কেন ? —শেফালী নীরব থেকে খাটের দিকে চলে গিয়েছিল। আলো জ্বেলে জামা খুলতে খুলতে ব্যস্ত বিপিন সংক্ষেপে বলেছিল, ভাত বাড়ো, খিদে পেয়েছে। শেফালী ততক্ষণে খাটে পা তুলে দেয়ালে পিঠ রেখে গোঁজ হয়ে বসে। বিপিন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। চিৎকার করে উঠেছিল, কি, কথার জবাব দিচ্ছ না যে বড় !—শেফালী তড়াক করে খাট থেকে নেমে তার দিকে এক পা এগিয়ে সমান চেঁচিয়ে উঠেছিল, মেজাজ দেখাচ্ছ কাকে, আমি কি তোমার কেনা বাঁদী—?-বিপিন ওকে কথা শেষ করতে দেয়নি। জুতোশুদ্ধ ডান পা-টা তুলে তলপেট বরাবর চালিয়ে দিয়েছিল।

আলো নিভিয়ে বড় ঘরে ঢুকতে শেফালীর দিকে চোখ পড়ায় বিপিন নতুন করে চমকে উঠল। প্রথমটায় সে চোখ বুজল। মেঝেয় অনড় পড়ে থাকা শেফালীর ছবিটা ভাঙতে চাইল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসে শেফালীর পায়ের কাছেই বসে পড়ল। ওর গালে টোকা মারল। গলায় সুড়সুড়ি কাটল। চিবুক ধরে নাড়াল। চোখের পাতা টেনে স্বাভাবিক করতে চাইল। নাকের ডগা, কানের লতি ছুঁয়ে শীতলতা অনুভব করল। তারপর ঠেলে ওঠা দুই হাঁটু সজোরে চেপে মেঝেয় টান টান নামিয়ে দিতে দেখল, নগ্ন শ্বেত পায়ের গোড়ালি বেয়ে রক্তধারা নিচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। ওকে পাঁজাকোলা করে খাটে তুলতে বিপিনের রীতিমত কষ্ট হল। তারপর, তোশকের তলা থেকে টিয়ে রঙের চাদরটা বের করে শেফালীর পায়ের ডগা থেকে গলা অবধি সে টেনে দিল।

দূরে গেঞ্জির কারখানায় পেটা ঘণ্টায় পর পর বারোটা শব্দ জেগে উঠতে বিপিন অস্থির হয়ে উঠল। এতক্ষণ সে শেফালীর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। সে বুঝল, এভাবে চুপচাপ থাকলে চলবে না। অথচ কি করবে ভেবে থই পেল না। কানের দু পাশের রগগুলো দপদপ করে জ্বলছে। ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। তার কান্না পাচ্ছিল। শেষে মনে হল, ব্যাপারটা বাড়িঅলাকে জানানো দরকার। এর চেয়ে বেশি কিছু সে ভাবতে পারছিল না। সুতরাং, বিপিন এবার সামনের দরজার কাছে এগিয়ে এল। দু হাত বাড়িয়ে খিল ধরে হ্যাঁচকা টান মারতে দরজাটা বিশ্রী কঁকিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডের ভেতর ঠাণ্ডা কিছু একটা নড়ে-চড়ে উঠল। বাড়িঅলা গিন্নী প্রায়ই তার ঘরে আসে। বিপিন দিনরাত দোকানে। শেফালী একলা। বিপিনের ভয় হয়, শেফালী যদি ওকে তার সম্বন্ধে সাত পাঁচ কিছু বলে থাকে—

বিপিনের কাঁপুনি ধরল। মগজের ভেতর এলোমেলো সব চিন্তা ছোটাছুটি করছে। বাড়িঅলা এমনিতে লোক মন্দ নয়। কিন্তু বেজায় ভিতু। সাদা মুখে বিপিনের কথা তিনি শুনবেন। কিন্তু ঘটনাটাকে সহজে

হজম করতে চাইবেন না। ভেতরে ঢুকে আড়ালে গিন্নীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। তারপর বিপিনকে বসতে বলে নিঃশব্দে উঠে যাবেন দোতলায়। থানায় ফোন করবেন। কিছুক্ষণ বাদে পুলিসের গাড়ি এসে দাঁড়াবে সদর গেটের মুখে। বিপিনের ঘর তচনচ করবে। মাঝরাতে পাড়া জেগে উঠবে। চারদিকের বাড়িগুলোর দরজা জানালা ভেঙে নানা মাপের মুখ উকিঝুঁকি মারবে। হাতকড়া লাগিয়ে পুলিশ তাকে গাড়িতে তুলবে। শেফালীর লাশ যাবে পরে। সকাল হতে না হতে এ তল্লাটের ছেলে বুড়ো সকলের মুখে মুখে তার নামটা ফেরাফেরা করবে। দোকানে তালা পড়বে। তার কথা কেউ মানতে চাইবে না। ময়না তদন্তের পর রিপোর্ট আসবে, শেফালীর তলপেটে লাথির দাগ পাওয়া গেছে।

দরজায় খিল এঁটে দিতে বিপিনের গা থেকে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর নামল। বরাবর সে একটু দুর্বলচিত্ত। গুরুতর কোন বিপদে পড়লে সাধারণত শেফালীই তাকে সাহস যোগাত। অথচ, এই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেফালীর দিকে তাকাতে তার ভয় হচ্ছে। দু হাতে খিলটা চেপে ধরে মাথা নিচু করে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়তে লাগল। তার ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শরীরটা ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসছে। শুধু মগজের ভেতর ভাবনাগুলো ক্রমাগত জট পাকিয়ে যাচ্ছে। থানা পুলিস লোক জানাজানি আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ফাঁসি—নাগরদোলায় চড়লে চারদিকের দৃশ্য যেমন দ্রুত ভেঙে যায় তেমনি এলোমেলো চিন্তা ক্রমাগত পাক খেতে লাগল।

সদর গেটের মুখে মোটরগাড়ির সাড়া পেয়ে বিপিন খিল ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটু বাদে লোহার গেট খোলার শব্দ শোনা গেল। সে প্রায় লাফিয়ে চকিতে আলোটা নিভিয়ে দিল। সুধীরের ভাঙা ভাঙা কথা শোনা যাচ্ছে। ও এবার বাগানে নেমেছে। দম বন্ধ করতে বিপিনের বুকের ওপর ভারি একটা কিছু হাঁটতে শুরু করল। হঠাৎ আলো নিভে যেতে ঘরটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। সে আর স্থির দাঁড়াতে পারছে না। তোতলা বাড়ির দরজায় করাঘাতের শব্দ জেগে উঠেছে।

বিপিনের দু'হাত কখন গলার কাছে এসে জড়ো হয়েছে। সামনের দিকে চোখ পড়তে সে আঁতকে উঠল। তার মনে হল, অন্ধকারে আড়মোড়া ভেঙে শেফালী যেন উঠে বসতে চাইছে। দোতলা বাড়ির দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা যেতে বিপিন অনির্দিষ্ট হাত বাড়িয়ে সুইচটা খুঁজতে লাগল আলো জ্বলে উঠতে খাটে শেফালীকে নিস্পন্দ পড়ে থাকতে দেখে বিপিনের বুক থেকে অনেকখানি হাওয়া বেরিয়ে এল।

এরপর সে শেফালীকে পেছনে রেখে ঘরময় পায়চারি শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে সে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। এলোপাথাড়ি চলাফেরায় তার চলন্ত ছায়া মেঝ থেকে সিলিং'এ দ্রুত উঠানামা করায় সে ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। অথচ থামাও যাচ্ছে না। কেননা দাঁড়িয়ে পড়তেই মগজের ভেতর ভাবনাগুলো নড়েচড়ে উঠেছিল।

রাত নিশুতি হয়ে এলে বিপিন টলতে লাগল। শেষে একসময় কখন সে ঘরের এক কোণায় বসে পড়ল। দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গলিয়ে সে স্থির হতে চাইছিল, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছিল। রান্নাঘরে আরশুলাদের ছোটাছুটির শব্দ, ঘুমভাঙা কাকের অস্ফুট ডাক, গেঞ্জির কারখানার পেটা ঘণ্টার আওয়াজ তাকে বারবার জাগিয়ে তুলছিল।

সকালে ঘর থেকে বেরুবার আগে বিপিন দরজা-জানালা ঠিক ঠিক বন্ধ আছে কিনা দেখে নিল। শেফালীর খুব কাছে এগিয়ে গিয়েও ওকে ছুঁতে সাহস হল না। শেফালীকে আরো শান্ত নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। বিপিন লক্ষ করল, ওর চুলের রাশি খাট থেকে নিচেরদিকে ঝুলে গেছে। আর চুল থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে মেঝেয়। দরজায় তালা লাগিয়ে গেটের কাছে আসতে অধীরের সঙ্গে দেখা। বাড়িঅলার বড় ছেলে। বাজার থেকে থলে হাতে ফিরছে। সে বলল, আজ যে এত তাড়াতাড়ি বিপিন?—দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে জলখাবার খেয়ে বিপিনের বেরুতে সাধারণত ন'টা হয়। ইতিমধ্যে সোনারপুর থেকে গোপাল এসে যায়। ও দোকান খোলে। অধীরকে পাশ কাটিয়ে কালভার্টে

উঠে বিপিন ফস করে বলে ফেলল, সামনে পুজো, তাই সকাল সকাল বেরুচ্ছি। বড়রাস্তায় পড়ে বিপিন আর পেছন ফিরে তাকাল না। জোরে পা চালাল।

শরতের শুরু। সকাল হতে না হতে রোদের রং গাঢ় হয়ে উঠেছে। চোখ কচলাতে জ্বালা শুরু করল। প্রাইমারি স্কুল পিছনে ফেলে মদন মিঞার বাড়ির কাছে এসে বিপিন রাস্তার কলের দিকে নেমে এল। মুখ ধুল। চোখে জল দিল। কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখ মুছতে শীত-শীত করতে লাগল।

রেলগুমটির কাছে এসে বিপিন দাঁড়িয়ে পড়ল। উত্তরে শহরতলি লোকালয়। দূরে স্টেশন দেখা যাচ্ছে। স্টেশনের ওপাশে বাজার। বাজারের মধ্যে তার ছোট দোকান। দোকানটা আজ বছর চারেকের। এর আগে সে ছিল বর্ধমানে। দক্ষিণে কোন বসতি নেই। দুপাশে নিচু জলো জমি। মাঝে মধ্যে তাল খেজুর নারকেল ছড়িয়ে আছে। বিপিন দক্ষিণমুখো রেল-লাইনে নামল। ঘাস জঙ্গল থেকে সকালের টাটকা হাওয়া উঠে আসছে। বিপিন পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাল। রাতের সব ঘটনা একে একে তার মনে পড়ে যাচ্ছে। একসময় শেফালীকে মনে পড়ে যেতে মগজের ভেতর পুরোনো চিন্তাগুলো কিল-বিলিয়ে উঠল। দূর রৌদ্রের দিকে চোখ পড়তে সে ভাবল, এই পথ ধরে কোথাও পালিয়ে গেলে কেমন হয়। যেখানে ইচ্ছে, ক্যানিং ডায়-মণ্ডহারবার বা সুন্দরবন। দাড়ি গোঁফ রেখে চেহারার ভোল পাল্টে নাম ভাঁড়িয়ে দিন কেটে গেলেই চলল। এসব কথা ভাবতে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করতে লাগল। সে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে এগুতে লাগল। শেষে ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে এসে পড়তে সে দপ্ করে নিভে গেল। মগজের ভেতর থানা পুলিশ ইত্যাদি ভাবনাগুলো চারিয়ে উঠতে সে থেমে গেল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

ডিসট্যান্ট সিগনাল থেকে স্টেশন অনেকটা পথ। ফিরে আসার সময়

বিপিনের পা আর চলছিল না। হাঁটুর মুড়ো ভেঙে আসছিল। ফলে সে মাঝে মাঝে থেমে পড়ছিল। আকাশ মাঠ দূরের উজ্জ্বল রোদ রেল-লাইনের ধারের খাদের দিকে অর্থহীন তাকিয়ে সে অনেকটা সময় নষ্ট করেছিল।

মাসের শুরু; দোকানে বেশ ভিড়। এক হাতে গোপাল সামলে উঠতে পারছিল না। বিপিন ভেতরে ঢুকতে এক খদ্দের হাঁক পাড়ল, কি ব্যাপার, আজ যে এত দেরি?—বিপিন নীরবে ছোট করে হাসল। আর একজন বললে, একটা কনডেন্স মিল্কের কৌটো দাও তো বিপিন। আর হ্যাঁ, ভিক্‌সের বড়ি আছে?—বিপিন মুখ তুলে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিল না। কেননা, তার দু চোখ অস্বাভাবিক লাল, মুখে রাত্রি-জাগরণের চিহ্ন, কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যেতে পারে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বিক্রিপাতি করার পর বিপিন হাঁপিয়ে উঠল। একঠায় সে বসে থাকতে পারছিল না। স্থির হয়ে বসলেই বুকের ভেতর ভারি কিছু একটা হেঁটে যায় মগজের ভেতরকার ভাবনাগুলো চিলিক মেরে ওঠে। একসময় সে উঠে দাঁড়াল। গোপালকে বলল, তুই দোকান বন্ধ করে চলে যাস, আমি বেরুচ্ছি। রাস্তায় নেমে পড়বার আগে সে কাঠের তাক থেকে কয়েক প্যাকেট ধূপকাঠি সঙ্গে নিল।

নিমগাছ পেরিয়ে ঘরের দিকে এগুতে গিয়ে বিপিন থেমে পড়ল। বাড়ি-অলার ছোট ছেলে মাধব পেছন থেকে তাকে ডাকছিল। মাধব এগিয়ে এসে বলল, একটা কথা ছিল যে।—বিপিন চোখ তুলল। মাধব বলল, কাল ডায়মণ্ডহারবার যাচ্ছি, পিকনিক করতে। দু পাউণ্ড রুটি দরকার। মাইরি বিপিনদা, যে করে হোক ম্যানেজ করতে হবে। নইলে প্রেস্টিজ পাংচার।—বিপিন হাসবার চেষ্টা করে বলল, ঠিক আছে, সে দেবো এখন।—মাধব বলল, কি ব্যাপার এত ধূপকাঠি—

কেন?—বিপিনের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে সংক্ষেপে জবাব দিল, আজ বাবার বাৎসরিক, তাই।—মাধব বলল, তাহলে ওই কথাই রইল। দেখো শেষটায় আমায় বিপদে ফেলো না কিন্তু।—বিপিন হাসতে

গিয়ে থেমে গেল। মাধব শিস দিতে দিতে বাগানে নামল। মেরুদণ্ডের ভেতরে কিছু একটা নড়েচড়ে উঠছে। বিপিন অবাক হল, কত অনায়াসে কিছু না ভেবে সে কেমন বানিয়ে কথা বলতে পারছে। অথচ কেউ তাকে ধরতে পারছে না। ঘরে ঢুকে নিশ্বাস নিতে একটা আঁশটে গন্ধ পাওয়া গেল। বিপিন প্যাকেট ভেঙে ধূপকাঠি খুলল। একটা মুখখোলা কৌটোর মধ্যে গোছাসুদ্ধ ধূপকাঠি বসিয়ে ধরাল, রাখল খাটের একপাশে বাইরে ভরদুপুর, অথচ ঘরের ভেতর কি অন্ধকার। শেফালীকে ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। দরজা জানালা সব বন্ধ। বাতাস নেই। একটা বিড়ি ধরাতে হাড়পাঁজরা ভেঙে কাশি এল। তাড়াতাড়ি বিড়িটা নিভিয়ে দেয়ালে হাত পড়তে বিপিন চমকে উঠল। একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। বিপিনের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। খাটে শেফালী শান্ত শুয়ে। তার মনে হল, বেশিক্ষণ এ ঘরে থাকলে সে-ও শেফালীর মত ধীরে ধীরে তাপহীন হয়ে পড়বে। দরজা বন্ধ করে বাইরে আসতে বিপিন দেখল, বাড়িঅলার দারোয়ান পেছনের পথ ধরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। বিপিন মাথা নিচু করে বড় বড় পা ফেলে গেটের দিকে এগুতে লাগল। দারোয়ান পেছন থেকে ডাকল, বিপিনবাবু, মাইজি আপনাকে বোলাচ্ছে।—বিপিন ঘুরে দাঁড়াতে দেখল, দোতলার ঝুল-বারান্দার রেলিঙে বুক ঠেকিয়ে বাড়িঅলা-গিন্নী দাঁড়িয়ে। বিপিন বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। বাড়িঅলা-গিন্নী বললে, একবার শেফালীকে পাঠিয়ে দেবে বিপিন!—বিপিন ঘর-ঘর শব্দ তুলে বলল, শেফালী তো নেই! শরীর খারাপ বলে আজ সকালে ওর ভাই এসে নিয়ে গেছে।—বাড়িঅলা-গিন্নী বললে, সে কি! আমি ভেবেছিলাম ওকে দিয়ে একটু কাসুন্দি করাব। প্রথম পোয়াতি। ভাল আস্থ হবে।—বিপিন হাসবার ভান করল। তারপর একটু সময় নীরব দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়ল।

বিপিন দোকানে পৌঁছতে বিকেল ভেঙে এল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এতক্ষণ সে এপথ ওপথ লাট খেয়েছে। দোকানে আসতে আদৌ তার ইচ্ছে ছিল না। কালীতলায় রামায়ণ পাঠ হচ্ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে

ছিল কিছুক্ষণ। তারপর এক চায়ের দোকানে। সেখান থেকে পার্কে। কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেনি। পরিচিত পথঘাট মানুষজন এড়িয়ে তাড়াখাওয়া কুকুরের মত সে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল। ইতি-মধ্যে গোপাল এসে কখন দোকান খুলেছে। ভেতরে ঢুকে সে স্থির বসতে পারেনি। ঝাড়ন নিয়ে অযথা আলমারি র‍্যাক পরিষ্কার করেছে। মালপত্তরের তত্ত্বতল্লাশ করেছে।

সন্ধ্যে হয়ে এলে খদ্দের কমে এল। শহরতলি অঞ্চল। এসময় ছেলে বুড়ো সবাই শহরের দিকে ছোটে। কিছুক্ষণ বিপিন মাসকাবারি হিসেবের খাতা নিয়ে বসেছিল। হিসেব করতে গিয়ে বারবার ভুল হয়ে যাওয়ায় সে খাতা তুলে রেখেছে। ছোটখাটো ত্রুটির জন্যে বারকয়েক গোপালকে ধমকেছে। তারপর রাত একটু ঘন হয়ে এলে সে উঠে পড়েছে। গোপালকে বলেছে, আমি বাজার থেকে আসছি, তুই বোস। দোকান থেকে রাস্তায় নেমে প্রথমেই তার মনে হয়েছিল, গোপাল কি তাকে সন্দেহ করছে? পরক্ষণে বিপিন মনে মনে হেসেছে। গোপাল ছেলেমানুষ, তেমন কিছু বুঝবার মত ওর বুদ্ধিই পাকেনি।

স্টেশনে এসে চায়ের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বিপিন এক কাপ ডবল হাফ চা খেয়েছিল। পেটে গরম জল পড়তে চাঙা ভাবটা ফিরে এসেছিল। তারপর সে নির্জনতার লোভে ওভারব্রীজের ওপর উঠে পড়েছিল। ব্রীজে লোকজন ছিল না। ভবঘুরে ভিক্ষুক, চায়ের স্টলের বয়, যারা এখানে রাত কাটায়—তাদের আসার সময় হয়নি তখনো। বিপিন চোখ নামাতে দেখল, প্ল্যাটফরম প্রায় জনহীন। ক্বচিৎ দু-একজন লোক চোখে পড়ে। দু পাশের বাড়িগুলোর জানালা বন্ধ। শহরতলির এই ধাত। এক প্রহর রাত না গড়াতে চারদিক নিঝুম হয়ে আসে। ফুরফুর করে বাতাস বইছে। আকাশের দিকে চোখ পড়তে বোঝা গেল, অমাবস্যার আর বেশি দেরি নেই। সজল হাওয়ার প্রলেপে কপালের দু পাশের রগগুলোর দপদপানি কমে আসছে। মগজের ভেতরকার জটগুলো আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। নিচের জনহীন প্ল্যাটফরমের ম্রিয়মাণ

আলোর দিকে চোখ পড়তে বিপিনের মনে হল, কাল রাত থেকে আজ সন্ধে পর্যন্ত যা যা ঘটনা ঘটেছে তা নেহাতই আজগুবি, যেন একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। এবং এ কথা মনে হতেই বিপিন চঞ্চল হয়ে উঠল। রাত তখনো ন'টা হয়নি। শেফালী এতক্ষণে রান্নাবান্না সেরে চুল আঁচড়াতে বসেছে। আজ এই সময় বাড়ি ফিরলে শেফালী রীতিমত অবাক হয়ে যাবে। ইদানিং শেফালী তাকে খুব কাছে পেতে চায়। অথচ কোন-দিন সে সাড়ে দশটা এগারটার আগে বাড়ি ফিরতে পারে না। এ সময়ে বিপিনকে দেখে ও খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠবে। সারাটা রাত বুকের মধ্যে মিশে গিয়ে তাপ দেবে। বিপিনের তর সইছিল না। সে হুড়মুড় করে করে নিচে নেমে এল।

প্ল্যাটফরমের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরাতে মগজের ভেতর পুরোনো ভাবনাগুলো ফের পাক খেয়ে উঠল। সামনের জনহীনতায় চোখ মেলে দিতে বিপিন বুঝল, এতক্ষণ ওভার-ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে সে যা ভাবছিল আসলে তার কোন বাস্তবতা নেই। এবং এ কথা মনে হতে সে রাগে বিড়িটা লাইনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জোরে পা চালিয়ে দোকানে চলে এল।

গোপাল তার অপেক্ষায় ছিল। বিপিন ভেতরে ঢুকে বলল, তুই চলে যা গোপাল, ট্রেনের সময় হয়ে এল। আর হ্যাঁ, কাল তোর ছুটি, আসতে হবে না।—বিপিন শেষের কথাগুলো বেশ জোর দিয়ে বলল। গোপাল মাথা নেড়ে রাস্তায় নামল।

রুটির গাড়ির আসতে বেশ রাত হল। গাড়ি রাস্তায় কোথায় খানায় পড়ে গিয়েছিল। মাল তুলে সব গুনে-গেঁথে হিসেব চুকিয়ে দোকান বন্ধ করতে এগারোটা বেজে গেল। দোকান থেকে বেরুবার সময় বিপিন একটা ওডিকোলনের শিশি আর এক বাণ্ডিল বড় সাইজের মোমবাতি সঙ্গে নিল।

ঘরে ঢুকে অন্ধকারেই বিপিন জামাজুতো খুলল। প্যাকেট ভেঙে মোম-বাতি জ্বালিয়ে মেঝেয় বসিয়ে দিল। কাল সারারাত বাতি জ্বলেছে।

বাড়িঅলা টের পায়নি। বা পেলেও কিছু বলেনি। আজও আলো জ্বলছে দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। বেজায় কৃপণ লোকটা। হয়ত দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে মাঝরাতে এসে ডাকাডাকি শুরু করে দেবে। বিপিন শেফালীর শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াল। আবছায়ায় স্পষ্ট দেখা না গেলেও বিপিন বেশ বুঝল, শেফালীর শরীর পচতে শুরু করেছে। দুপুরের আঁশটে গন্ধটা মজে গিয়ে এখন ওর কাছে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। সে শেফালীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে ওডিকে-লন ছড়াতে লাগল। ওডিকোলনের গন্ধে বমি আসছে। বিপিন তাড়াতাড়ি শিশি উপুড় করে সবটুকু ওডিকোলন ঢেলে দিয়ে ঘরের মাঝখানে চলে এল।

সদর গেটের আলোটা জ্বলছে। আজ রেসের দিন। বাজি জিতলে সুধীরের ফিরতে অনেক রাত হবে। বিপিন বিড়ি ধরাল। এই গুমোট ঘর, অন্ধকার, শীতল, খাটে টানটান শুয়ে থাকা শেফালী, সব কিছু সে এখন সহজেই মেনে নিতে পারছে। সে বিড়বিড় করতে লাগল। যতী-নের কথা বারবার বিপিনের মনে পড়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ওকে কাছে পেলে সে ছিঁড়ে ফেলত। সে-ই বিয়ের সম্বন্ধটা এনেছিল। বিপিনের ইচ্ছে ছিল না। যতীন জোর জবরদস্তি করে তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়েছিল।

গেঞ্জির কারখানার পেটা ঘণ্টায় একটা বাজল। সুধীর ফিরছে না। সুধীর দুশ্চরিত্র মাতাল। বাড়িঅলার একসময় ক্যানিং স্ট্রীটে গদি ছিল। কালোবাজারে বিস্তর পয়সা কামিয়ে লোকটা এই জমি-বাড়ি করেছে। অধীর বাদে আর সব কটা ছেলেই অপদার্থ। এখন পাপের ফল ভোগ করছে লোকটা। বিপিন ঘরময় থুথু ছিটোতে লাগল। শেফালীর ওপর তার রাগ হচ্ছে। দু বছরের সংসার। শেফালীকে ভাল রাখবার জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। ওর যখন যেটা বায়না, আজ শাড়ি, কাল গয়না পরশু সিনেমা, সাধ্যমত যুগিয়েছে। ইদানিং ব্যবসার অবস্থা খারাপ। চারদিকে দেনা। যেকোন সময় দোকান লাটে উঠতে পারে। সে শেফালীকে কিছুই জানতে দেয়নি। তবু ও অশান্তি করেছে, সন্দেহ

করেছে। বিপিন মোমবাতি পালটাল। মুখের ভেতরটা বিস্বাদ লাগছে। বাঁহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সে পিচুটি তুলল। এইজন্য সে বিয়ে করতে চায়নি। মেয়েমানুষ জাতটাই স্বার্থপর। দিনরাত পশুর মতো খাটো। টাকাকড়ি সব পায়ে ঢালো। তবু যদি একটু সুখ পাওয়া যেত। সুধীর ফিরল অনেক রাতে। বিপিন সতর্ক ছিল। লোহার গেটে শব্দ উঠতে সে এক ফুঁয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল। দোতলা বাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনার কিছু পরে ফের মোমবাতি জ্বালাল। এইটুকু সময়ের ভেতর সে একটা ফন্দি এঁটে ফেলল। এর জন্য মনে মনে সে শেফালীকে তারিফ করল। কেননা, শেফালীই এ বাড়িটা পছন্দ করে-ছিল। বিপিন হাতে হাত ঘষল, শব্দ করে পিচ কাটলো। পেছনের দরজা খুলে শেফালীকে পাঁজাকোলা করে উঠোনটুকু পার হওয়াতে যা ধকল। তারপর কলাঝোপের ভেতর দিয়ে জলো জমিতে নেমে পড়া। বর্ষার জলে এখন ও-দিকটা থইথই করছে। খুব একটা মেহনত নেই। অন্ধকারে কিছুটা এগিয়ে কচুরিপানার নিচে কাদার ভেতর পুঁতে দেওয়া। তারপর বর্ষার জল শুকুতে পুজো পেরিয়ে শীত এসে যাবে। ততদিনে শেফালী মাটির তলায়, খুঁজেও হদিশ মিলবে না।

বিপিন পায়চারি শুরু করল। কিছুটা সময় অপেক্ষা করা দরকার। আর ভাবতে লাগল, কয়েক দিন বাদে সে বাড়িঅলাগিন্নীকে জানিয়ে দেবে, তার ছেলে হয়েছে। এদিকে তলে তলে সে দোকান বিক্রির চেষ্টা করবে। দর-দাম ঠিক হলে বাড়িঅলাকে বলবে, ব্যবসাপাতির অবস্থা খারাপ। সে বাইরে চাকরি পেয়েছে। ঘরটা ছেড়ে দিয়ে রাতারাতি দূরে কোথাও চলে যাবে।

শেফালীকে বের করবার আগে সে পেছনের দরজা খুলল। চারদিক একবার পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। উঠোনের দিকে চোখ পড়তে বিপিন অবাক হয়ে গেল। দেখল ও-বাড়ির ঝুলবারান্দা থেকে এক ঝলক তীক্ষ্ণ আলো উজ্জ্বল বর্শা-ফলকের মতো ছুটে তার উঠোনে নেমে এসেছে। শুধু ঝুলবারান্দায় নয়, বাড়িঅলার ঘরেও আলো জ্বলছে।

বাড়িঅলা ব্লাডপ্রেসারের রুগী। হয়ত একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। বিপিন একবার ভাবল, এগিয়ে গিয়ে দারোয়ানকে ডেকে ব্যাপারটা কি হয়েছে জিজ্ঞেস করবে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে শেফালীর কথা মনে হতে সে পেছিয়ে এল। আলো বাঁচিয়ে উঠোনের কোণায় এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকাতে দেখল, অগুনতি তারা নিঃশব্দে জ্বলছে। কলাঝোপের মাথায় কালপুরুষ দাঁড়িয়ে। কোমরে ছোরা, পা দুটো ছড়ানো। উদ্ধত, নিশ্চল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অন্ধকারে লেবুগাছের পাতা নড়ছে। বিপিন বুঝতে পারল না রাত কত।

ঘরে ঢুকতে মাথায় রক্ত চড়তে শুরু করল। পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাওয়া চলবে না। উঠোনের ধারালো আলোপথটুকু পেরুবার সময় দোতলা থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে। রাগে ক্ষোভে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে। সকাল হতে আর কতটুকুই বা বাকি। শেফালীর পচন ধরেছে। রাতের মধ্যে ওকে পাচার করতে না পারলে সমূহ বিপদ। গত রাতের পুরোন ভাবনাগুলো মগজের ভেতর পাক খেতে শুরু করেছে। বিপিন শেফালীকে উদ্দেশ্য করে একটা অশ্লীল গালাগালি দিয়ে উঠল।

তারপর এক সময় চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। তা দুচোখ শিকারী বেড়ালের মত জ্বলছে। সে এক লাফে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে এল। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে বঁটির বাঁট থেকে ফলাটা খুলে নেবার সময় একটা প্রকাণ্ড গাছের মত তার শরীরটা কাঁপছিল। বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠছিল। বড়ঘরে এসে লোহার ফলাটা শেফালীর শিয়রের কাছে রেখে সে ঘন করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর খাটের পাশে বসে পড়ল। গলা থেকে চাদরটা ছাড়িয়ে নেবার সময় তার হাত এসে শেফালীর তল পেটে থামল। নিবিড় করে পেটে হাত চেপে ধরতে সে বুঝতে পারল, শেফালীর বাচ্চার শক্ত মাথাটা সে স্পর্শ করেছে। বিপিনের শরীরের ভেতরকার অসংখ্য ঝাঁঝরি দিয়ে ঝরনাধারার মত রক্তস্রোত নিঃশব্দে নিচের দিকে নেমে যেতে

লাগল। বুকের তলা থেকে খানিকটা বুদ্‌বুদ জেগে উঠল। দিনের বেলা দুজনের মধ্যে বনিবনা না হলেও রাতে আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠে শেফালী তার খুব কাছে চলে আসত। পেটে বাচ্চা আসবার পর থেকে শেফালী বিপিনকে খুব কাছে পেতে চাইত। অন্ধকারে তার একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের তলপেটে চেপে ধরে শেফালী বলত : দেখো, দেখো ; তোমার বাচ্চা কি রকম নড়ছে। এই, এই যে পা—।--কোনদিন বলত : এই যে মাথা। বুঝতে পারছ না ?—শেফালীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিপিন পাশবালিশটা টেনে দুজনের মাঝখানে রেখে পাশ ফিরে ধমকের সুরে বলত : নাও এবার ঘুমোও দেখি। কেবল বকর বকর।—আসলে বিপিনের ভয় হত, ঘুমের ঘোরে সে যদি ওর পেটে গুঁতো মেরে বসে ! একদিন সে বাচ্চার স্বপ্নও দেখেছিল।

বিপিন তলপেট থেকে খুব আলতো করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। শেফালীর মত তার শরীরও ধীরেধীরে তাপহীন হয়ে পড়ছে। এক দমক কান্না বুক ঠেলে বেরুতে চাইছে। সে অনেক কষ্টে শেফালীর শিয়রের কাছে চলে এল। মোমবাতিটা বাঁহাতে তুলে নিল। গলায় হাত রাখতে টের পেল, শেফালীর শরীর শীতলতায় টলটল করছে। তারপর মোমবাতিটা ওর মুখের কাছে ধরতে বিপিনের চোখ আর্দ্র হয়ে এল। দুই ঠোঁট তিরতির করে কাঁপতে লাগল। সে শেফালীকে চিনতে পারছে না। সেই শেফালী—দুবছর আগে বনগাঁ থেকে বিয়ে করে এই ঘরে এনে তুলেছিল, যার টানা টানা উজ্জ্বল দুই চোখ, তীক্ষ্ণ চিবুকে হাসির আভা, ছোট কপাল, পাতলা ভ্রূ, ফোলা-ফোলা গাল, কাঁচা হলুদের মত রং। আর এখন, বিপিনের গলা ঠেলে এক দমক বোবা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। দুই চোখ বসে গিয়ে দেখা যাচ্ছে না, গাল আর কপাল ভেঙে মাথার দুপাশে হাড় বেরিয়ে পড়েছে, কানের পাতা নেমে এসেছে, নাক ডেবে গেছে।

এমন সময় বাইরে মাধবের গলার আওয়াজ শোনা গেল। সে ডাকছে,

বিপিনদা, ও বিপিনদা।—বিপিনের বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। মুখ তুলে তাকাতে দেখল, দেয়ালের অনেক উঁচুতে সিলিং ভেদ করে সকালের রোদ এসে জমেছে। মাধব রুটির জন্য এদিকে আসছে। ও এখন বাগানে। বিপিন বুঝল, মাধব ডাকতে ডাকতে নিমগাছটুটো পেরুবে। তারপর দরজার কাছে এসে কড়া নাড়তে শুরু করবে। ভেতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নাছোড়বান্দা মাধব পশ্চিমের জানালার কাছে এগিয়ে এসে খড়খড়ি তুলে চেঁচাবে।
কিন্তু, এই মুহূর্তে, বিপিনের উঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তার সমস্ত শরীর এখন একতাল মাংসপিণ্ডের মত অসাড়। বিপিন মোম-বাতিটা নামিয়ে শেফালীর দিকে ঝুঁকে এল। সে আরো কিছুটা সময় পাচ্ছে; অন্তত এইটুকু সময়—যতক্ষণ না পশ্চিমের জানালার খড়খড়ি নড়ে ওঠে, শেফালীকে দেখবার। হাতের মোমবাতিটা কাঁপছে। আলো-ছায়ায় গভীর দৃষ্টি ফেলে ভ্রুক্ষেপহীন বিপিন শেফালীকে দেখতে লাগল।

## মানুষ

দরজার খিল খোলার শব্দে বিকাশের ঘুম ভাঙল। মঞ্জু বেরিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিন হলে সে ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। ফের বাপিকে জড়িয়ে ধরে আরো কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকত বিকাশ। আজ পারল না। তেড়েফুঁড়ে উঠে বসল। মঞ্জুকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল। কোন রকম কুসংস্কার নেই বিকাশের। আজ তবু ভোরবেলা বেরুবার মুখে মঞ্জুকে পেছু ডাকতে তার বাধল।

গতকাল অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল বিকাশ। ফেরার পথে পার্কে দুজনে কিছুক্ষণের জন্য বসেছিল। তখনই বিকাশ মঞ্জুকে অনেক করে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল। তবু ওর ওপর আস্থা কম। সুহাসিনীর সামনে পড়ে যদি বেফাঁস কিছু বলে মঞ্জু ব্যাপারটাকে শুরুতেই কাঁচিয়ে দেয়— এই আশঙ্কায় খাট থেকে নেমে পড়ল বিকাশ। বাবা দাদা বারান্দায়। রান্নাঘরে রাধুনি ঝি। হাড়িতে ভাত ফুটছে। বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন। পাশে দাদা। দাড়ি কামাচ্ছে। ওকে সকাল সকাল কাজে বেরুতে হয়। সবকিছু স্বাভাবিক। প্রতিদিনকার মতই। শুধু বৃষ্টিশেষের ভোরবেলাটাই যা অন্যরকম। মলিন। আলোর বড়ই অপ্রাচুর্য। মেঘচাপা রোদ পাণ্ডুর।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বাথরুমের দিকে চোখ পড়তে বিকাশের মগজে রক্ত

চড়ল। সুহাসিনী বাথরুমের দরজা খুলে ঝুমরিকে নিয়ে বেরুচ্ছেন। ওর মুখোমুখি পড়ে গেছে মঞ্জু। দুধের দাঁত পড়তে শুরু করলে মেয়েকে মা-বাবার সঙ্গে একই খাটে শোওয়া বিপজ্জনক মনে করে বিকাশই আজ এক বছরের ওপর হয়ে গেল ঝুমরিকে সুহাসিনীর ঘরে চালান করে দিয়েছে। বিকাশের বুক কেঁপে উঠল। সুহাসিনী কি সব যেন বলছেন মঞ্জুকে। এমন সময় ঘরের ভেতর বাপি কেঁদে উঠতে পায়ের তলায় মাটি পেল বিকাশ। সে গলা চড়িয়ে বলল, মা, বাপি উঠে গেছে। শিগ্গীর এসো।

দাঁতে ব্রাশ চেপে কুয়োতলায় চলে এল বিকাশ। কুয়োতলার ওধারে মস্ত পগার। ওটাই বাড়ির সীমানা। তারপর রাস্তা। রোদ মলিনতর হচ্ছে। আকাশের গতিক ভাল নয়। মনে মনে আবহাওয়ার মুণ্ডুপাত করল বিকাশ।

চোখমুখে জল দিতে হঠাৎ নজরে এল। মঞ্জু দাদার ঘরে। বৌদির সঙ্গে কথা বলছে। সেদিকে চোখ পড়তে রাগে গজগজ করতে লাগল বিকাশ। সকালবেলা বৌদির সঙ্গে এত কি কথা থাকতে পারে। মঞ্জুর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে। বড় আলগা স্বভাবের মেয়েমানুষ। কোন ব্যাপারেই গুরুত্ব দিতে চায় না। নিম্‌মুখে কুয়োতলা থেকে ফিরে এল বিকাশ।

দাদার দাড়ি কামানো শেষ। কাঁধে গামছা। কুয়োতলার দিকেই যাচ্ছে। মাঝের ঘরে সুহাসিনী। বাপিকে কোলে নিয়ে বসে দুধ খাওয়াচ্ছেন। এতক্ষণে মঞ্জুর কথা শেষ হল। ও ঝুমরিকে নিয়ে ঘরে ঢুকছে। বিকাশ বারান্দায় উঠে হাঁক পাড়ল, মতির মা, চা দিয়ে যাও।

ঘরে ঢুকে বিকাশ বলল, একি, আবার বিছানা নিয়ে বসলে যে! বেরুতে দেরি হয়ে যাবে কিন্তু—।—বেডকভার দিয়ে বালিশ চাপা দিতে দিতে রুষ্ট গলায় উত্তর করল মঞ্জু, বারে, বাসি বিছানা ফেলে রেখে যাব নাকি?—ড্রেসিং টেবিলের কাছে এসে চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে বলল বিকাশ,

এতক্ষণ বৌদির সঙ্গে কি বকবক করছিলে ? —মঞ্জুর গলা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল, তোমার কি সব কথাই জানা চাই ?—না মানে, তোমাকে তো বিশ্বাস নেই। ফস্ করে কি বলতে কি বলে ফেল।

বাইরে টিপটিপানি শুরু হয়ে গেছে। মঞ্জু বিকাশের কথায় জবাব না দিয়ে আলমারি থেকে কাপড় নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বারান্দায় মতির মার গলা শোনা গেল, ছোটদাদাবাবু, চা।

বিকাশ বলল, সঙ্গে একটা শাড়ি নিয়ো কিন্তু—। –মঞ্জু খেপে গেল, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

মতির মার হাত থেকে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বাবান্দায় বসল বিকাশ। সে সবে চায়ে চুমুক দিতে যাবে এমন সময় কাগজ থেকে মুখ তুলে বাবা বললেন, রাবিশ ! পড়ার মত যদি কোন খবর থাকে। শুধু খুন দাঙ্গা আর রক্তপাতের সংবাদ—

'রক্তপাত' শব্দটা ছুরির ফলার মত ধাঁ করে মাথায় গেঁথে যেতে বিকাশের হাত কেঁপে উঠল। খানিকটা গরম চা চলকে তার বুকে পড়ল। সে সবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে চড়া গলায় বলল, যা বলেছ। আগামী মাস থেকে ভাবছি কাগজ বন্ধ করে দেব।—যৌথ পরিবার। সাংসারিক খরচ খরচার মধ্যে দৈনিক কাগজের টাকা জোগানোর দায়িত্ব বিকাশের ভাগে পড়েছে। বিকাশ মাত্রাতিরিক্ত চেঁচিয়ে ওঠায় দুই ভ্রু জোড়া করে বাবা একবার তার দিকে তীর্যক তাকলেন। লজ্জিত বিকাশ নিজেকে সংশোধন করার জন্য বলল, খবরের কাগজওয়ালাদের যত কাণ্ড! ওরা কি ভাল খবর খুঁজে পায় না—।—বাবা নিজের বিরক্তি লুকোবার জন্য ফের কাগজে চোখ রাখলেন।

স্নানশেষে দাদা কুয়োতলা থেকে ফিরে আসতে বিকাশ চঞ্চল হয়ে উঠল। এক নিশ্বাসে সে চায়ের কাপ শূন্য করল। যে করেই হোক নটার ভেতর তাদের পৌছুতে হবে। বিকাশ উঠে মাঝের ঘরে চলে এল। খেলনা নিয়ে বাপি খাটের মাঝখানে বসে আছে। সুহাসিনী সিংহাসনের

করছে। বাবার রিটায়ারমেন্টের পর থেকে সুহাসিনীর দেবদ্বিজে ভক্তি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। হতে সময় বেশি নেই। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বিকাশ বলল, আমরা কিন্তু এখ্‌খুনি বেরিয়ে যাচ্ছি মা।—সুহাসিনীর হাতে ছোট ছোট পেতলের থালা-গেলাস। শান্ত গলায় বললেন, তুই স্নান খাওয়া করে যাবি না?—ফের হেতুশূন্য চড়া গলায় বিকাশ বলল, না-না। মঞ্জুকে অমলের বাড়ি পৌছে দিয়েই আমাকে অফিসে ছুটতে হবে। কাল রাতে জমি প্রস্তুত করে রেখেছিল বিকাশ। বলেছিল: কাল ভোরবেলা মঞ্জুকে নিয়ে অমলের বাড়িতে যাব। ফিরতে কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাবে।—সুহাসিনী বলেছিলেন: অমল! সে আবার কে?—অমলকে তুমি চিনবে না মা। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম।—বিকাশ বলেছিল।—হঠাৎ ওর বাড়িতে সারাদিন, নেমন্তন্ন নাকি?—না, ওসব নয়, হেসেছিল বিকাশ, আজ হঠাৎ ওর বউ কলতলায় পড়ে গিয়ে কোমড়ে চোট পেয়েছে।—সে কিরে! বউটি পোয়াতি নয় তো?—মার বিপজ্জনক প্রশ্নটাকে কোন রকমে বিকাশ পাশ কাটিয়েছিল: না-না। এম্নি হঠাৎ পড়ে গেছে। ভীষণ ব্যথা। উঠে বসতে পারছে না। এদিকে ঘরে বাচ্চাকাচ্চা স্বামী। কে ওদের রেঁধে খাওয়ায়। অমল কাল সকালে কৃষ্ণনগরে যাবে। ওর মাকে নিয়ে আসতে। তাই ভাবছি কাল সকাল সকালে মঞ্জুকে নিয়ে ওর বাড়িতে যাব। যাতে রান্নাটা করে দিতে পারে।—বলতে গেলে পুরো একটা অনুচ্ছেদ। বানিয়ে বলতে গিয়ে শেষের দিকে তোৎলাচ্ছিল বিকাশ। শেষ পর্যন্ত সুহাসিনীই ওকে সামলে ছিলেন, নিশ্চই যাবি। এই দুঃসময়ে—

বেরুবার মুখে ঝুমরি বায়না ধরেছিল সঙ্গে যাবে। বিকাশ ধমকে উঠেছিল। মঞ্জু বলেছিল, মেয়েটাকে ও ভাবে বকছ কেন। ছেলেমানুষ না! নীচের রাস্তায় এসে বুক থেকে পাথর নামল বিকাশের। একটা সিগারেট ধরাল সে। ফুসফুস দুটোকে ধোঁয়ায় তপ্ত করে নিয়ে বলল, যাক ভালয় ভালয় বেরুনো গেল।—কথাটা যেন কানে গেল না, এই ভঙ্গিতে প্রশ্ন

করল মঞ্জু, কটা বাজে ?—হাতঘড়িতে চোখ রাখল বিকাশ, আটটা পাঁচ। ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব আমরা।—কথাটা শেষ করে সে হাত নেড়ে অদূরবর্তী এক সাইকেল রিক্সাকে ডাকল। মঞ্জু বলল, আবার রিক্সা কেন? বাসস্টপ কতটুকু বা পথ—। —রিক্সা এগিয়ে এল। মেঘ পাতলা হতে শুরু করেছে। বিকাশ এখন ভিন্ন মেজাজের। মঞ্জুকে খুশি করতে ব্যস্ত। ওর কথাটা গায়ে মাখল না। বলল, ব্যাগটা আমাকে দাও।—রঙচঙে কাপড়ের ব্যাগটা মঞ্জু বিকাশের দিকে এগিয়ে দিতে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হল। একটা সাধারণ শাড়ি পরেছে মঞ্জু। তাড়াহুড়োয় ভাল করে চুল আঁচড়াতে পারেনি। প্রসাধনহীন মুখ। তবু আটপৌড়ে মঞ্জুকে দেখতে ভাল লাগছিল বিকাশের।

সাইকেল রিক্সায় উঠে বিকাশ বলল, আসলে কি জানো, যা হার্ড মার্কেট। আজকাল এসব আকছার ঘরে ঘরে হচ্ছে, তবু ঢাকঢোল পিটিয়ে সকলকে জানান দিয়ে যাওয়ার তো কোন মানে হয় না।

মঞ্জুর চোখ তখন রাস্তার চলাচলের দিকে। সে এক সময় উন্মনা বলে উঠল, বাপিটা সারাদিন ঘরে একলা থাকবে।—ওর কাঁধে হাত রেখে আলতো করে চাপ দিয়ে নরম গলায় বিকাশ বলল, একটা বেলার তো মামলা। মা আছে বাড়িতে, অত ভাবছ কেন।

দোতলা বাড়ি। নার্সিং হোম এক তলায়। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলে খানিকটা প্যাসেজ। প্যাসেজের শেষে দরজা। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে বাঁয়ে ছোট একটা খুপরি। অফিসঘর। তার ওধারে অপারেশন রুম। ডাইনে করিডোর। করিডোরের দুপাশে কেবিন। বেড অল্পই। সামনের দিকে সিঁড়ি। দোতলায় ডাক্তারবাবু সপরিবারে থাকেন।

কাল সন্ধ্যায় এখানে এসে মঞ্জুর ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল। টাইলস বিছানো মেঝে। ডিসটেমপার করা দেয়াল। সিঁড়ির দুধারে মস্ত পেতলের ভাস। তাতে রাশিকৃত জিনিয়া বসানো। সবকিছু সাজানো-গোছানো, সম্ভ্রান্ত। ডাক্তারবাবু দেখতে সুপুরুষ। কথাবার্তায় চোয়াড়ে ভাব নেই।

ফেরার পথে মঞ্জু বলেছিল ঃ দেখেশুনে তো ভালই মনে হল। ডাক্তারবাবু মানুষটিও বেশ।—আত্মগর্বে ফেটে পড়েছিল বিকাশ ঃ হুঁ হুঁ এবার বুঝলে তো। আমি তোমাকে আজেবাজে জায়গায়— !—মাঝপথে মঞ্জু থামিয়ে দিয়েছিল ঃ থাক্, আর বড়বড় কথা বলতে হবে না। তোমাকে চেনা হয়ে গেছে আমার।—কালমুখে মঞ্জুর কথা ক'টা নীরবে হজম করেছিল বিকাশ। আহত হয়েছিল মনে মনে। হবার সঙ্গত কারণ ছিল। আজকাল শহরের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত নার্সিং হোম গজিয়ে উঠছে। চটকদার সাইনবোর্ডের আড়ালে সেগুলোর অধিকাংশই পাপ-ব্যবসায়ের এক-একটা বড় ঘাঁটি। যত হাতুড়ে ডাক্তারের ভিড় সেখানে। সেরকম কোথাও ঢুঁ মারলে অর্থের সাশ্রয় হত। তবু সেপথ বিকাশ মাড়ায়নি। গড়বড় কিছু একটা হয়ে গেলে সারাজীবন বুক চাপড়াতে হবে, এই ভেবে। অনেক খোঁজখবর নিয়ে তবে সে এখানে এসেছে। নামকরা ডাক্তার। অনেকগুলো বিলিতি ডিগ্রী আছে! বড় একটা হাসপাতালের সঙ্গেও যুক্ত।

ওরা পৌঁছবার মিনিট পনের বাদে অপারেশন-রুম থেকে নার্স বেরিয়ে এল। গতকাল ওই নার্স মঞ্জুকে অ্যাটেণ্ড করেছিল। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল, এসে গেছেন।—ধপধপে সাদা ইউনিফর্ম। ভরন্ত শরীর। চোখমুখ উজ্জ্বল। বিকাশ ভাবল ঃ সারাদিন নোংরা ঘাঁটে। তবু নার্সদের সব সময় উজ্জ্বল দেখায় কেন।

বিকাশ এগিয়ে গেল। ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, অপারেশন কখন হবে ?—অনভিপ্রেত প্রশ্নে নার্সের চোখে বিরক্তির ছায়া নামল। বলল নির্বিকার গলায়, এই কিছুক্ষণের মধ্যেই। আরো মিনিট পনের বাদে ডাক্তার দোতলা থেকে নেমে এলেন। পরনে একটা ঢিলেঢালা অ্যাপ্রন। বিকাশের সঙ্গে চোখাচোখি হতে তিনি আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। গটগট করে অপারেশনরুমের দিকে চলে গেলেন। পেছনে সেই নার্সটি। বিকাশের দুপা কাঁপছিল। নার্স ডাকল মঞ্জুকে, আসুন।—বিকাশের হাত থেকে কাপড়ের থলিটা নিতে

নিতে রক্তশূন্য মুখে মঞ্জু বলল, যাই।—বিকাশ উত্তরে কিছু বলতে পারল না। তার বুকের ভেতর তখন যেন কেউ একটা চাকা ঘোরাচ্ছিল সবেগে। তারপর কিছু সময় অস্থির উত্যক্ত বিকাশ। একবার বেঞ্চে বসেছে। একবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। বারবার সে হাতের পিঠ দিয়ে চিবুকের ঘাম মুছে ফেলছিল। একটা কাতরোক্তি চাপা, হয়ত মঞ্জুর। বালতি জাতীয় কিছু মেঝেতে ঘসটে টেনে নিয়ে গেলে যেরকম হয় সেই জাতীয় শব্দ। ছুরি-কাঁচির ধাতব আওয়াজ। সিগারেট ক্ষয়ে বিকাশের আঙুলের ডগা পুড়ে গেল একসময়। হঠাৎ পাশের কেবিনে একটা বাচ্চার চিৎকার জেগে উঠল। বিকাশের মনঃসংযোগ কেটে গেল। এখানে ডেলিভারিও হয় নাকি? ভাবতে গিয়ে অবাক হল সে।

অফিস-ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। বিকাশকে ডাকল। অফিস-ঘরে ঢুকে টাকা জমা দেবার সময় হাত কেঁপে যাচ্ছিল বিকাশের। সে শুধোল, ভয়ের কিছু নেই তো?—নোটগুলো গুণতে গুণতে লোকটা বলল, না-না। ডাক্তারবাবুর পাকা হাত।—বিকাশ আরো আশ্বস্ত হতে চাইল, না মানে,আমার ওয়াইফ খুব নার্ভাস কিনা।—লোকটা বিকাশের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকাল। হাসল একটু, ঘাবড়াবার কিছু নেই। মাইনর অপারেশন। সকালবেলা জিভছোলা দিয়ে জিভ পরিস্কার করেন না, অনেকটা সেইরকম আর কি।

নাম সই করতে গিয়ে লেখা জড়িয়ে যাচ্ছিল বিকাশের। লোকটা অভয় দিল, এ কিছু নয়। ফরমালিটি সেক আমরা বণ্ডে সই করিয়ে রাখি।—বিকাশ মাথা নাড়ল। হাসতে চাইল, বলল, তাতো বটেই।—সইপর্ব শেষ হলে লোকটা বিকাশের হাতে একটা প্রেসক্রিপশন ধরিয়ে দিল, যান এই ওষুধগুলো নিয়ে আসুন।

এ দোকান ও দোকান ঘুরতে বিকাশের দেরি হয়ে গেল। সব ওষুধ-ইনজেকশন এক দোকানে পাওয়া গেল না। নার্সিংহোমে ফিরে আসতে এক মাঝবয়সী আয়া বিকাশের হাত থেকে ওষুধগুলো নিল। বিকাশ

বলল, অপারেশন হয়ে গেছে?—আয়া মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। এই প্রথম বুঝি?—প্রশ্নটা বোধগম্য হল না বিকাশের। সে বলল, মানে, আমার দুটি ইস্যু আছে।—আয়ার চোখের দৃষ্টি ঘন হয়ে এল, ওঃ। সত্যি যা দিন কাল পড়েছে।

বিকাশ একবার অপারেশন রুমের দিকে গেল। আধভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। টেবিলে শুয়ে আছে মঞ্জু। গলা অব্দি সাদা চাদরে ঢাকা। দু চোখ বোঁজা। ভেতরে শুধু নার্স ছিল। সে বিকাশকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। কর্কশ গলায় বলল, একি! আপনি এখানে কেন। চলে যান।—বিকাশ অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল, একটা কথা বলব ওকে।—নার্স বলল, এখন কি বলবেন। পেসেণ্টের তো সেন্সই ফেরেনি।

—ওকে কখন রিলিজ করবেন?

—তা, তিনটে সাড়ে তিনটের আগে তো নয়ই।

—খাবারদাবার কিছু আনতে হবে?

—পেথিডিন দেওয়া হয়েছে। আজ সলিড কিছু খেলেই বমি করে ফেলবেন।—নার্স অধৈর্য হয়ে উঠল।

—গরম দুধটুধ?—বিকাশ নাছোড়বান্দা।

—দুধ, তা চলতে পারে। তাও ঘণ্টাতিনেক বাদে—।বলেই নার্স দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘড়িতে তখন পৌনে এগারটা। এতটা সময় বিকাশ কি করবে ভেবে পেল না। শেষমেশ নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এল। দু একজনকে জিজ্ঞেস করতে পোস্টঅফিসের সন্ধান পেয়ে গেল।

টেলিফোনের কাছে লাইন। সামনে একটি মেয়ে। মাথায় তালখোঁপা। ভি-কাট ব্লাউজ। ব্র্যার ষ্ট্র্যাপের একটা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। মুখে হাল্কা পাউডারের প্রলেপ। চোখের ওপরের পাতায় কাজলের পুরু টান। সমানে বকবক করছিল: এই শান্তনু, প্লীজ। অ্যাঁ, টিকিট কেটে ফেলেছ! আড়াইটার সময় মেট্রোয়। ইমপসিবল; আজ এস, কে, জির ইমপর্টেন্ট

ক্লাশ আছে। কলেজ কাটব? বলো কি! এই রাগ করলে। ঠিক আছে, বড্ড সেন্টিমেণ্টাল তুমি—,মেয়েটি কুলকুল করে হেসে উঠতে ওর কাঁধের মসৃণ মাংসে ঢেউ খেলে গেল। মনে মনে হাসল বিকাশ। খুব মজা, না! টের পাবে একদিন। ভাল করে ফাঁসটা জড়াক। বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর কালে কালে সব জারিজুরি ঘুচবে। কোথায় যাবে শরীরের গুমর। দেখা যাবে, সব দেখা যাবে।

ফোন ধরল কল্যাণ। একই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে। বলল, কে—? আমি।—শ্লেষ্মা ভাঙল বিকাশ।—আমি কে? নামটা বলুন।—বিকাশ নাম বলতে কল্যাণ বলল, ও বিকাশদা, তুমি! কোত্থেকে ফোন করছ? —পোস্টঅফিস থেকে। —বিকাশের কণ্ঠস্বরে জোর এল না। —কি খবর বলো! —শশব্যস্ত কল্যাণ বলল। —খবর কিছুই নয়। দেরি হয়ে গেল। ভাবছি অফিসে যাব কিনা।—দেরি হয়েছে তো কি হয়েছে।—কল্যাণ অবাক কণ্ঠে বলল।—না মানে, আজকে শনিবার কিনা। একেই হাফ-ডে। তারওপর লেট।—আমতা আমতা করল বিকাশ। সেইজন্যই তো আসবে। মিছিমিছি একটা সি-এল নষ্ট করে লাভ কি—।—কল্যাণ সদুপদেশ বর্ষণ করল।—সেকথা হচ্ছে না।—কথা শেষ করতে পারল না। কল্যাণ ততক্ষণে লাইন ছেড়ে দিয়েছে। অফিসে পৌঁছতে কল্যাণ বলল, ব্যাপার কি বিকাশদা! চোখমুখ উস্ক-খুস্ক—।—কিছু না। এম্নি। সকালের দিকে বেহালায় এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম তাই।—হাত নেড়ে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করতে চাইল বিকাশ।

খাওয়া দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই?—কল্যাণ প্রশ্ন করল।—না, হাসল বিকাশ, যাই ক্যান্টিন থেকে কিছু খেয়েআসি। আর হ্যাঁ, মিস্টার মুখার্জি এসেছেন? —না, উনি রাইটার্সে গেছেন। সেখান থেকে আসবেন।

নিশ্চিন্ত হল বিকাশ। শিস দিতে দিতে বাথরুমের দিকে চলে গেল তারপর।

বেসিনের সামনে এসে আয়নার দিকে মুখ তুলতে চমকে উঠল বিকাশ। নিজেকে চেনাই যাচ্ছে না। তামাটে মুখ, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরপর দুদিন দাড়ি কামানোর ফুরসুৎ হয় নি। দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে সমতা নেই। অবিন্যস্ত চুল। তাড়াতাড়ি বিকাশ ট্যাপ খুলে মাথা নিচু করে চোখে মুখে জল ছিটোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ছুটির মুখে গেরো। মিস্টার মুখার্জি চেম্বারে ঢুকে বিকাশকে তলব করলেন। সুইংডোর ঠেলে চেম্বারের ভেতর ঢুকতে মিস্টার মুখার্জি বললেন, আসুন বিকাশ বাবু। আপনার অপেক্ষায় আছি।—বিকাশ শুধোল, কেন স্যার? পাইপে তামাক ভরতে ভরতে মিস্টার মুখার্জি বললেন, একটা জরুরি কাজের জন্যেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আপনি সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট হ্যাণ্ড। একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করে দিতে হবে। সোমবার আরলি আওয়ার্সে ওটা রাইটার্সে পাঠাতে হবে। ঝালমশলায় কটকটে ডিমের কারি, তার সঙ্গে কাঁচা পাঁউরুটি। ক্যান্টিন থেকে অখাদ্য গিলে এসে বিকাশের বুক জ্বালা করছিল। তার ওপর নতুন দুঃসংবাদ। তার মেজাজটা মুহূর্তে টকে গেল। তবু চেষ্টাকৃত হেসে বলল, ঠিক আছে।

অফিস থেকে বেরুতে চারটা বেজে গেল। বাইরে তখন নতুন করে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে গোটা কলকাতা শহর এবং তৎসহ মিস্টার মুখার্জির চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে বিধ্বস্ত বিকাশ কোনক্রমে এসে পৌঁছুল নার্সিংহোম।

কেবিনে আধশোওয়া হয়ে আয়ার সঙ্গে গল্প করছিল মঞ্জু। বাস থেকে নেমে পাঞ্জাবি হোটেল থেকে ভাঁড়ে করে গরম দুধ নিয়ে ভেতরে ঢুকল বিকাশ। জিজ্ঞেস করল, কেমন আছো? নড়েচড়ে উঠল মঞ্জু, ভালই। এক লহমায় ওকে জরিপ করে নিল বিকাশ। শ্রমকাতর মুখ। সবচেয়ে

যেটা লক্ষণীয়, ওর চোখের উজ্জ্বলতাটুকু যেন কেউ ছেঁকে বের করে নিয়েছে।

নাও ধরো। দুধের ভাঁড়টা মঞ্জুর দিকে এগিয়ে দিল বিকাশ।—আবার দুধ কেন ?—ক্ষীণকণ্ঠে বলল মঞ্জু।—চুপ করো দেখি। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি।—চাপা ধমকের সুরে বলল বিকাশ।

ডাক্তারবাবু ছিলেন না। দুপুরের দিকেই হাসপাতালে চলে গেছেন। অফিসঘরের লোকটা সব বুঝিয়ে দিল। কখন কোন ওষুধটা খেতে হবে।

মঞ্জুকে হাতে ধরে আয়া রাস্তা পর্যন্ত এসেছিল। খুশি হয়ে বিকাশ ওকে একটা আস্ত পাঁচ টাকার নোট দিয়ে ফেলেছিল। মঞ্জু ট্যাক্সির ভেতরে গিয়ে বসলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আয়া বলেছিল চিন্তার কিছু নেই মা। তিনটে দিন একটু ভারি কিছু তুলবে না, হাঁটাচলা কম করবে আর আগুনের আঁচ লাগাবে না।

ট্যাক্সি ছাড়তে বিকাশ মঞ্জুর কাছে সরে এল। একটা অপরিচিত ওষুধের গন্ধ ফুটে উঠছিল ওর শরীর থেকে। মঞ্জু সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজতে বিকাশ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, খুব কষ্ট হচ্ছে ?—চোখ খুলল মঞ্জু। মলিন হাসল, না।—তিনটে দিন তো মোটে। মতির মাকে বলব, বিকেলের রান্নাটাও করতে। তার জন্যে ওকে না হয় কয়েকটা টাকা দেব।—বিকাশ আস্তে আস্তে বলল। মঞ্জু কিছু বলল না। ফের চোখ বুঁজল।

মৌলালীর মোড়ে এসে বিকাশ বলল, ড্রাইভার এখানে একটু গাড়িটা থামান।—মঞ্জু শুধোল, এখানে কেন ?—ট্যাক্সি থেকে নেমে যাবার আগে বিকাশ বলল, বাপি আর ঝুমরির জন্যে কিছু পুতুলটুতুল কিনব। রথের মেলা। অপর্যাপ্ত খেলনা। কেনাকাটা সারতে বিকাশের দেরি হল না।

ট্যাক্সি গড়িয়াহাটের মোড় ছাড়ালে বিকাশ বলল, তুমি সোজা গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়বে। কারুর সঙ্গে কথা কইবে না। আমি সব ম্যানেজ

করব—।—মঞ্জু তখন বাইরের দিকে তাকিয়ে। ক্লান্ত চোখে ছুটন্ত বৃষ্টি-ভেজা শহরটাকে দেখছে।

বারান্দায় বাপিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সুহাসিনী। মঞ্জু ঘরের ভেতরে চলে গেল। ছেলেকে শুধোলেন সুহাসিনী, হ্যাঁরে, বউটা এখন কেমন আছে?—ভাল নয়। শরীরের বাঁদিকটা অবশ হয়ে গেছে। ডাক্তার বলছে—পারসিয়াল প্যারালিসিস।—গড়গড় করে বলল বিকাশ।

—আহারে। বলিস কি। কচি বয়স। কত কি-ই যে ঘটছে আজকাল। খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসেছিল মঞ্জু। সুহাসিনী ঘরে ঢুকে বললেন, তোমার আবার কি হল ? মঞ্জু উত্তর দেবার সুযোগ পেল না। বিকাশ বলে উঠল, মাথা ধরেছে। জ্বরও হয়েছে বোধহয়। মঞ্জু ডাকল, আয় বাপি। বাপিকে ওর কোলে তুলে দেবার সময় সুহাসিনী বললেন, জ্বর হলে আজ রাতে আর ভাত খেয়ে কাজ নেই বউমা।

বৃষ্টিবাদলার দিন—

ঝুমরি পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে খেলছিল। বাবার গলার আওয়াজ পেয়ে ছুটে এল। বিকাশ বলল, এই ছাখ তোদের জন্যে কত পুতুল কিনে নিয়ে এসেছি।

সুহাসিনী পাশের ঘরে চলে গেলেন। মঞ্জু শুধোল, তোর জেঠিমা কইরে ঝুমরি ? দেখছি না।—ঝুমরি বলল, জেঠুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে। অন্যদিন হলে বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠত। দাদা-বৌদি বেশ আছে। বিয়ে এগারো বছরের ওপর হয়ে গেল, ওদের ছেলেপুলে হবার নাম নেই। দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ কিন্তু বিকাশ তেতে উঠল না, বরং বাড়িতে বৌদি নেই জেনে আশ্বস্ত হল।

বাপি মঞ্জুর শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে আদর খাচ্ছিল। বিকাশ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মঞ্জুকে। এমন সময় পাশের ঘরে শাঁখের ফুঁ বেজে উঠল।

রাতে আলো নিভিয়ে বিকাশ খাটে উঠে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন আছো মঞ্জু ?

অন্ধকারে মঞ্জুকে দেখা যাচ্ছিল না। মাঝখানে বাপি। ওধার থেকে মঞ্জু উত্তর করল, ভালই—

বড় করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল বিকাশ, যাক্‌, ব্যাপারটা নির্বিঘ্নে চুকে গেছে। কেউ টের পায়নি।

মঞ্জুর সাড়া পাওয়া গেল না।

পাশের ঘরে সুহাসিনীর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সুহাসিনী অনেক রাত অব্দি জাগেন। বাবার রিটায়ারমেণ্টের পর থেকে মার ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত অব্দি ঠাকুরের সিংহাসনের সামনে বসে থাকেন। কি করেন কে জানে। হয়ত সংসারের মঙ্গলকামনায় ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন।

মঞ্জু এই, মঞ্জু। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?—একটা হাত বাড়িয়ে অন্ধকারে মঞ্জুকে খুঁজল বিকাশ।

মঞ্জু বলল, কি চেঁচাচ্ছ কেন?

না মানে, বলছিলাম, শরীর ভাল আছে তো? —চেরা গলায় বলল বিকাশ।

হঠাৎ শিয়রের দিকের জানালাটা ঠকঠক শব্দে নড়ে উঠল। একটা তীব্র ফোঁসফোঁসানির আওয়াজ শোনা গেল।

বিকাশ বুঝল—আবার ঝড়বৃষ্টি আসছে।

থাক, আর ন্যাকামো করতে হবে না। তুমি একটা জানোয়ার। একটা প্রাণকে খুন করে এখন সোহাগ দেখাতে এসো না।

বিকাশের বুকের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। সে আর একটা কথাও বলল না। নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে পড়ে বাপিকে কাছে টানল। বুকের মধ্যে নিয়ে এল। বাপির হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকধ্বনির শব্দ শুনতে লাগল।

এক সময় অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি না নামলে টের পেত মঞ্জু— বাপিকে বুকের গভীরে টেনে নিয়ে আটশ' আটান্ন টাকা মাইনের এক আধা সরকারি অফিসের কেরানী বিকাশ সরকার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

## জোড়

মাস তিনেক আগের কথা। তিলপ্রমাণ একটা গোটা। উঠেছিল ঠিক পিঠের মাঝামাঝি জায়গায়। একেবারে শিরদাঁড়ার ওপরে। এতদিনে সেটা বড় হয়ে উঠেছে। টিপলে কাবলিমটর সাইজের একটা হড়হড়ে মাংসপিণ্ডের মত লাগে। তবে কোন জ্বালাযন্ত্রণা বা অস্বস্তি না থাকায় এতকাল গা করেনি অনু। কিন্তু আজ সে প্রথম টের পায়, যতটা ভেবেছিল গোটাটা তত নিরীহ নয়।

বেলা সাড়ে দশটা। নীলু ঝিমলি স্কুলে চলে গেছে। খাওয়া শেষ করে প্রেমাংশু বড়ঘরে। কুসুম এঁটো বাসন ধুয়ে কলতলা থেকে ফিরছে। অনু রান্নাঘরে। উনুনে অ্যালুমিনিয়মের কড়াইয়ে ডুমো ডুমো পানিকচু সেদ্ধ হচ্ছে। অনু সবে রুটির সঙ্গে পটলভাজা পাটিসাপটা করে মুখে তুলতে যাবে এমন সময় প্রেমাংশুর বিকট চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে খাবারটা নামিয়ে বাটি চাপা দিয়ে জিভ কাটে অনু। তারপর তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে, আচমকা শিরায় টান ধরলে যেমন হয়, একটা খিচ ব্যথা তেমনি গোটার ভেতর থেকে বিদ্যুৎগতিতে সেঁধিয়ে গিয়ে শিরদাঁড়াটাকে নিচের দিকে টেনে ধরে।

সাধারণত অনু এরকম বেখেয়াল হয় না। বহুকালের অভ্যেস। অফিসে বেরুবার সময় অনু কাছে না থাকলে চলেনা প্রেমাংশুর। অনুকে সব দেখেশুনে জুগিয়ে দিতে হয়। নইলে অনর্থ ঘটে। মাস্থলি কলম

টিফিনকৌটো মানিব্যাগ একটা না একটা কিছু ফেলে যাবেই প্রেমাংশু। সকাল থেকে বাড়িতে যা লঙ্কাকাণ্ড চলে! তাতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে অনুর পক্ষে সবদিক সামলানোই দায়। রাত ফর্সা হবার আগেই কুসুম এসে দরজার কড়া নাড়ে। ধড়মড়িয়ে উঠে অনু সোজা চলে যায় বাথ-রুমে। চটপট বাসি কাপড় ছাড়ে। তারপর রান্নাঘরে ঢোকে। সেই যে শুরু হয়ে যায়, আর শ্বাস ফেলবার সনয় পায় না। প্রেমাংশুর বেড-টি, বিছানা তোলা, সকালের জলখাবার আর সেইসঙ্গে তিনজনের টিফিন তৈরি, উনুনে ভাত চাপিয়ে বড়ঘরে এসে কিছুক্ষণের জন্য ঝিমলিকে নিয়ে পড়াতে বসে থই পায়না অনু। থলিভর্তি বাজার নিয়ে প্রেমাংশু ফিরে আসতে লেগে যায় হুড়োহুড়ি। নিত্য নতুন অর্ডার প্রেমাংশুর। কোনদিন ট্যাংরা মাছের ঝাল আর বড়ি দিয়ে মোচাঘণ্ট। কোনদিন কটকটে মৌরলার চচ্চড়ি আব তিত্ পুঁটির টক। কোনদিন আবার চিংড়ির মালাই আর সরষে দিয়ে মানকচু বাটা। মাঝে মাঝে কুসুম তেতে ওঠে। গজগজ করে। অনু তো দশভুজা বা ম্যাজিশিয়ান নয়। বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলে না অনু। সে জানে শুধু প্রেমাংশু নয়, পৃথিবীর বেশির ভাগ পুরুষই এমনিধারার। ভীষণ অবুঝ। তাছাড়া খাওয়ার ব্যাপারে প্রেমাংশুর বায়নাক্কা থাকলেও হাকাই নেই। পরিমাণে সে যে খুব বেশি খায় তা নয়। তার চাই কম করে তিন-চারটে সরেস পদ। খেতে বসে মাঝে মাঝে জিভে টকাস্ করে অদ্ভুত একটা শব্দ তুলে মাথা নেড়ে বলবে, 'ফাইন', কিংবা 'চমৎকার হয়েছে'। তবেই বোঝা যাবে গোপাল তুষ্ট।

অনুকে অর্ধেকটা উঠে ফের হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে দেখে কুসুমের হাতের বাসনগুলো নড়ে ওঠে। সে ভেতরে ঢুকে পড়ে চাপা গলায় বলে, 'কি হল বৌদি! শরীরটা খারাপ লাগছে নাকি?'

উত্তর করে না অনু। দুহাতে ভর রেখে দম্ নেয়। চোখ বোঁজে। ব্যথাটা হজম করতে চায়।

প্রেমাংশু বেরিয়ে যাবার পরেই সকালের খাবার নিয়ে বসে অনু। কিন্তু আজকের এই ভুলের পেছনে একটা কারণ আছে। নীলু যা খায় কাল রাতে তার ডবল খেয়েছিল। উঠতি বয়স। মাঝেমধ্যে ও এরকম করে বসে। শেষমেশ হাঁড়িতে যেটুকু ভাত অবশিষ্ট ছিল তাতে অনুর পেটের সিকি ভাগও ভরেনি। ফলে আজ সকাল থেকেই খিদেটা ক্রমশ ফন-ফনিয়ে উঠছিল। শেষে প্রেমাংশু আঁচিয়ে ঘরে ঢুকতে নিজের অজান্তেই খাবারের বাটিটা টেনে নিয়েছিল সে। কিন্তু ভুল ভুলই। মেয়েমানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা লোভছোঁচ থাকতে নেই। সংসারের এই দস্তুর।

'কই, একবার এদিকে আসবে—!'—বড়ঘর থেকে আরেক প্রস্থ প্রেমাংশুর গর্জন ভেসে আসতে নড়েচড়ে ওঠে অনু। বলে, 'তুই এদিকটা একটু ছাখ্, কুসুম। আমি আসছি—'

বড়ঘরে ঢুকে অনু দেখে ধুন্ধুমার কাণ্ড। টেবিলের ওপরের ডাঁই করা কাগজপত্র সব ছত্রাকার। কিছু মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

অনু বলে, 'কি হল, চেঁচাচ্ছ কেন?'

'চেঁচাব না তো কি! রবীন্দ্রসংগীত গাইব?'—প্রেমাংশুর ফর্সা মুখ লাল। সে ফের বলে, 'ইলেকট্রিক বিলটা পাচ্ছি না। আজকেইজমা দেবারলাস্ট ডেট—'

'সে কি!'—অনু এগিয়ে যায়, 'কোথায় রেখেছিলে?'

'কোথায় আবার, টেবিলে। ডায়েরির খোপের ভেতর।'

'দাঁড়াও দেখছি।'—ব্যথাটা গোটার চারপাশে জোর কটকটাচ্ছে। টেবিলের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় মুখে হাসি টেনে শান্ত শুধোয় অনু, 'ভালো করে মনে করে ছাখো, অন্য কোথাও রাখোনি তো?'

'বাজে বোকো না। এটা কি বাড়ি! এ তো খাটাল। নিশ্চয়ই কেউ আমার ডায়েরিটা হাঁটকেছে।'—গর্জন আরো বেড়ে যায় প্রেমাংশুর। অনু আর কথা বাড়ায় না। পুরুষমানুষের এই আরেক স্বভাব। মেয়েরা যত নরম হয় ওদের হম্বিতম্বি তত বাড়ে।

নইলে সকালের দিকে প্রেমাংশুর কিইবা এমন কাজ। ইচ্ছে করলেই নিজের দরকারি জিনিসপত্র আগেভাগে গুছিয়ে রাখতে পারে। তা নয়, বাজারের থলিটা রান্নাঘরের মুখে উপুড় করে দিয়েই ছুটবে পাশের মুখুজ্জেবাড়িতে। সেখানে অষ্টপ্রহর তাসের আড্ডা চলছে। ফেরে দশটা নাগাদ। তারপর শুরু হয়ে যায় হুলুস্থুলু। দাড়ি কামাতে বসে গাল কাটে। বাথরুমে ঢুকে চেঁচায়। গামছাটা কই গেল। শিশিতে যে এক ফোঁটা তেল নেই। আণ্ডারওয়ারটা শিগ্‌গির দিয়ে যাও। চলে একনাগাড়ে। একেবারে সেই অফিস বেরুনো পর্যন্ত। আসলে উত্তেজনা ছাড়া কাজ করা ধাতে নেই প্রেমাংশুর।

অবশেষে ফোলিও ব্যাগের ভেতর থেকে বিলটা উদ্ধার করে অনু।

দুপুর থেকে ব্যথাটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। নীলু স্কুল থেকে ফিরে একরকম জোরজার করেই অনুকে নিয়ে যায় চক্রবর্তী ডাক্তারের কাছে। তিনি ভাল করে গোটাটা পরীক্ষা করে কিছু ক্যাপসুল আর ট্যাবলেট লিখে দেন।

বাড়ি ফিরতে বেলা ভেঙে আসে। অনু আর বড়ঘরে ঢোকে না। কলতলায় গিয়ে হাত পা ধুয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। কুসুম বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছিল। বেশ কয়েক বছর হল সে এ-বাড়িতে ঠিকে কাজ করছে। সকাল-বিকেল দুবেলাই আসে। ছুটে এসে বলে, 'তুমি সরো বৌদি। রাতের রান্নাটা আজ না হয় আমিই করে দিয়ে যাচ্ছি।'

অনু ছাড়া আর কারুর রান্না মুখে রোচে না প্রেমাংশুর। তাই ব্যথায় শিরদাঁড়া ভেঙে এলেও হেসে বলে অনু, 'এদিকে আসতে হবে না তোকে। পারলে বরং বড়ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়ে যা।'

ঠিক কথাই বলে অনু। অফিস ছুটির পর প্রেমাংশু যায় বড়বাজারে। এক মাড়োয়াড়ির গদিতে পার্ট-টাইম কাজ করে। রাত ন'টা নাগাদ তিরিক্ষে মেজাজ নিয়ে ফেরে। তার আগেই বড়ঘরের সব নিপুণ হাতে গুছিয়ে রাখে অনু। বিছানাটা পরিপাটি করে পাতে। টেবিলের বই-

পত্তর গুছিয়ে খবরের কাগজটা মাঝখানে পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখে। একপাশে রেকাবে ঢাকা থাকে এক গ্লাস জল। শুকনো লুঙ্গিটা আলনার ঠিক জায়গায় পাট করে ঝুলিয়ে দেয়। বাথরুমে বাড়তি দু' বালতি জল মজুত থাকে। এর একটু নড়চড় হলেই চেঁচাতে শুরু করে প্রেমাংশু।

রাতের খাবারের প্রথম আইটেম ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুশাক। মুখে দিয়েই বলে প্রেমাংশু, 'মুন কম, একদম ঝাল হয়নি।' —তারপর পটলের দোলমার খানিকটা গলাধঃকরণ করে স্বমূর্তি ধারণ করে, 'রাবিশ! ভেতরে পুর দাওনি। ঘরে কি আদাপেঁয়াজও নেই। আশ্চর্য! এখন খাই কি দিয়ে—'

অনু ভাল-মন্দ কিছুই বলে না। বলার মত শক্তি নেই তার। পোড়া-মলঙ্গী হলে যেমন হয়, তেমনি তার সারা পিটটা দপ্‌দপাচ্ছে।
নীলু ছোট ঘরে। আসছে বছর মাধ্যমিকে বসবে। সামনেই প্রিটেস্ট। চাপা স্বভাবের ছেলে। বাবার চিৎকারে বই থেকে মুখ তোলে। মানুষটার নিষ্ঠুরতায় ভেতরে ভেতরে ফুঁসে ওঠে সে।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে না। প্রেমাংশু মাঝপথে পাতে জল ঢেলে উঠে পড়ে। ঘরে এসে চেয়ারে বসে মুখ থুম্বো করে খবরের কাগজের পাতা উল্টোয়। এমন সময় প্রেমাংশুকে পান সেজে দেবার জন্য বড় ঘরে ঢুকতেই টাল সামলাতে না পেরে অনু ধপ্‌ করে মেঝেয় বসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে অনুর দিকে এগিয়ে যায় প্রেমাংশু। পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে নীলু। ঝিমলি হাউমাউ কান্না জুড়ে দেয়। জোর ধমক লাগায় প্রেমাংশু। নীলুর কাছ থেকে খুঁটিয়ে সব বৃত্তান্ত জেনে নেয় প্রেমাংশু। গোটাটা একবার ভাল করে দেখে। ফুলে পাকা করমচার মত লাল হয়ে আছে। তারপর শুরু হয় গর্জনতর্জন। বলতে থাকে: কতদিনের পুরোন গোটা। অথচ আমি কিছুই জানি না! তা জানব কেন। আমি তো এ-সংসারে ফেগ্‌লু

পার্টি। কিন্তু এখন! কে ঝামেলা পোয়াবে। এবার ডাকো পাড়াপড়শীকে। তারাই তো তোমার···

কিছুতেই প্রেমাংশুর রাগ পড়ে না। আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েও গজরাতে থাকে। প্রেমাংশুর মাঝে ঝিমলি। ঝিমলির ওধারে অনু। প্রেমাংশুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাতরাতে থাকে অনু।

পরদিন থলিহাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রেমাংশু। পাশেই চক্রবর্তীর চেম্বার। প্রেমাংশু উঁকি মারে। ডাক্তারবাবু সবে এসেছেন। প্রেমাংশুকে দেখে বলেন, 'আসুন প্রেমাংশুবাবু। বলুন, মিসেস এখন কেমন আছেন?'

'ভাল নয়।'—চক্রবর্তী এ-পাড়ার পুরোন ডাক্তার। প্রেমাংশু এগিয়ে মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়ে বলে, 'কাল সারারাত ঘুমুতে পারেনি। আজও—'

'পেনকিলার এ পর্যন্ত কটা খেয়েছে?'

'তিনটে।'

'স্ট্রং!'—সিগারেট ধরাতে গিয়েও থেমে যায় চক্রবর্তী। দৃষ্টি ভেতরের দিকে গুটিয়ে গুম্ মেরে থাকেন কিছুক্ষণ।

প্রেমাংশু মুখে ছায়া নামায়, 'আপনার কি মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবু?'

'না, মানে, তিন-তিনটে স্ট্রং পেনকিলার খেয়েও ব্যথা কমল না। এরকম তো হবার কথা নয়।'—একটু থামেন চক্রবর্তী। তারপর ভারি গলায় বলেন, 'প্রথম থেকেই আপনাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

প্রেমাংশু ফ্যাকাশে হাসে, 'ঘরের কথা আর কি বলব ডাক্তারবাবু। আমি সবে কাল রাতে জানলাম—'

'ব্যাপার কি জানেন, এবার সিগারেট ধরান চক্রবর্তী, 'টিউমারটা যে ঠিক মেরুদণ্ডের ওপরে হয়েছে। ডেঞ্জারাস জায়গা। কি থেকে কি হয়ে যায় বলা তো যায় না।'

'আপনি এখন কি করতে বলেন ডাক্তারবাবু?'—অধৈর্য গলায় প্রশ্ন করে প্রেমাংশু।

'হয়ত তেমন কিছু নয়। তবু বলি কি, নড়েচড়ে ওঠেন চক্রবর্তী, 'সময় থাকতে একটা বায়প্সি করিয়ে নিলে ভাল হয়।'

বাজারের দিকে আর এগোয় না প্রেমাংশু। পাশের ওষুধের দোকানে ঢুকে চক্রবর্তীর পরিচিত এক নামকরা নার্সিংহোমে ফোন করে। তারপর পাড়ার মুদি দোকান থেকে আলু আর ডিম কিনে বাড়ি ফেরে। রান্না-ঘরের দোরগোড়ায় এসে বলে, 'অনু উঠে এসো। আজ কুসুম রাঁধবে।'

চমকে ওঠে অনু। কি শান্ত নিরুত্তাপ গলা প্রেমাংশুর। কুসুমকে ডাকে প্রেমাংশু। বলে, 'তোমাকে আজ আমাদের এখানে থাকতে হবে কুসুম। দুপুরের দিকে অনুকে নিয়ে আমি একটু বেরুব।'

কুসুম মাথা নাড়ে। অবাক হয়ে অনু শুধোয়, 'কোথায়?'

'একজন বড় ডাক্তারের কাছে।'—বলে ঘরের দিকে পা বাড়ায় প্রেমাংশু।

প্রেমাংশুর কথামত ঝিমলি-নীলু স্কুলে যায় না। অনু খাটে ঘট হয়ে বসে থাকে। প্রেমাংশু ঝিমলিকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে স্নান করায়। নিজের হাতে বাসি গেঞ্জি-আণ্ডারওয়ার কাচে। তারপর একবার বেরোয়। ব্যাঙ্কের দিকে যায়।

দেড়টা নাগাদ নীলু ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসে। ঝিমলি বায়না ধরে সঙ্গে যাবে। অনেক করে প্রেমাংশু বোঝায়। শেষে একটা কিছু নিয়ে আসবে এই কবুল করে শান্ত করে মেয়েটাকে।

বড় রাস্তায় পৌঁছে ট্যাক্সি ব্রিজের ওপরে উঠলে অনু বলে, 'এসব পাগলামীর কি দরকার ছিল বুঝি না। সামান্য একটা গোটা। তার জন্য বড় ডাক্তার দেখানো, মিছিমিছি কতগুলি পয়সা নষ্ট করা—'

কথাটা ভেতরে টেনে নিতে প্রেমাংশুর বুক কেঁপে ওঠে। সত্যি হয়ত মিছিমিছিই ভাবা যাচ্ছে। এ ধরনের রোগের উপসর্গ বাইরে থেকে ধরা পড়ে অনেকদিন বাদে। আসলে ভেতরে টিউমারটা কতদূর ছড়িয়ে গেছে কে জানে।

'কি হল সর্দারজী। বললাম না, দেখেশুনে চালাবেন।'—ট্যাক্সি চৌ-রাস্তা থেকে মৃদু ঝাঁকানি খেয়ে ডানদিকে বেকতে ধমকের সুরে বলে ওঠে প্রেমাংশু। তারপর অনুর দিকে ঝুঁকে গলার স্বর মুহূর্তে কোমল করে ফেলে, 'এই লাগল নাতো?'

এক কাৎ হয়ে চোখ বুঁজে ঝিমোচ্ছিল অনু। প্রেমাংশুর কথায় নড়েচড়ে উঠে বলে, 'না।'

'ব্যথাটা এখন কেমন আছে?'—আরো ঝোঁকে প্রেমাংশু।

চোখের কোনে হাসি ধরে অনু। প্রেমাংশুর দৃষ্টি কেমন যেন বিহ্বল। বলে, 'আগের চেয়ে অনেক কম।'

অনুর হাসিটা ছুরির ফলার মত বুকে বেঁধে প্রেমাংশুর। ওর এই হাসিটুকুই মারাত্মক অসহ্য। বরাবরই অনু আশ্চর্যরকমের শান্ত, নিরুত্তেজ; শত অসুবিধা থাকলেও মুখ ফুটে সে কথা প্রকাশ করে না কখনো। খুব তিতিবিরক্ত হলে মাঝে মাঝে অনুচ্চ গলায় স্বগতোক্তির মত করে বলে: তুমি তো আছো নিজেকে নিয়ে। সংসারের খবর কতটুকু রাখো। প্রেমাংশু উত্তরে কিছু বলে না। অপরাধবোধের পলতেটা কেউ যেন ফস করে জ্বালিয়ে দেয় ভেতরে। বাইরের দিকে চোখ ফেরায় সে। বৃষ্টিভেজা মেঘচাপা মলিন দুপুর। নির্জন রাস্তা। দুধারে বড় বড় গাছের প্রহরা। তার ভেতর থেকে উঁচু পাঁচিল তোলা বাড়ি উকিঝুঁকি মারতে থাকে। একটা চাপা অস্বস্তিতে জ্বলতে থাকে প্রেমাংশু। ভাবে, এর চেয়ে অনু খানিকটা খরতর হলে ভাল হত।

মস্ত তিনতলা পুরনো আমলের বাড়ি। ট্যাক্সি সোজা গাড়িবারান্দার নিচে গিয়ে থামে। ভেতরে ঢুকতে বাঁয়ে রিসেপসন। ছোট একটা প্লাইউডের চৌখুপি। ভেতরে একজন বসে। ডাক্তার চক্রবর্তীর কথা বলতে খাতা খোলে লোকটা। দেখে বলে, 'বায়প্সির কেস তো? তিন নম্বর কাউন্টারে যান।'

টাকাপয়সা জমা দিয়ে প্রেমাংশু ভিজিটিং রুমে ফিরে আসতে অনু বলে, 'এখানে নিয়ে এলে কেন। এ তো নার্সিংহোম—'

'হ্যাঁ', ঢোক গেলে প্রেমাংশু 'এই তোমাকেএকটু চেক-আপ করিয়ে নিতে এসেছি।'

'একটা গোটার জন্য চেক-আপ'—চাপা বিরক্তি উদ্‌গার করে অনু, 'সব ব্যাপারে তোমার এত বাড়াবাড়ি—'

প্রেমাংশু রাগ করেনা। বরং আশ্বস্ত হয়। যাক, তাহলে কিছু বুঝতে পারেনি অনু। এটাই সে চেয়েছিল। নিজেকে নিজে তারিফ করে মনে মনে। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে এখানে নিয়ে এসেছে। ক্যান্সার হাসপাতালে নিয়ে গেলে নির্ঘাৎ অনু ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলত।

সব মিলিয়ে ঘণ্টাখানেকের মামলা। ভেতর দিকের একটা ঘর থেকে গোমড়া মুখে বেরিয়ে আসে অনু। টিউমারটার ওপরে আড়াআড়ি লাগানো তুলোয় ঢাকা ছোট কাপড়ের পটি। প্রেমাংশু আর কথা বাড়ায় না।

নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটারেষ্টুরেণ্টে ঢুকে পড়ে ওরা। পর্দা-আঁটা কেবিনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে। বয় এসে সেলাম ঠুকতে খাবারের অর্ডার দেয় প্রেমাংশু। পুরোন দিনের কথা মনে পড়ে যায় অনুর। আটষট্টি সালের কথা। তখন প্রেমাংশু থাকত বাগবাজারে। দাদাদের সংসারে। নীলু সবে পেটে এসেছে সেবার চালের দর চড়চড়িয়ে পাঁচ টাকায় উঠেছিল। রুটি একদম সয়না অনুর। অথচ বিকালে তো বটেই সকালেও ভাতের সঙ্গে আধাআধি রুটি চিবুতে হত। তারওপর যৌথ পরিবারের এক.ঘয়ে লাতারে রান্না। ব্যাপারটা পরপর কদিন লক্ষ্য করে প্রেমাংশু। তারপর ছুটির দিনগুলোয় এটাসেটা অজুহাত দেখিয়ে বিকালের দিকে অনুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। সোজা ভাল হোটেলে ঢুকে ভরপেট মাছভাত খাইয়ে বাড়ি ফিরত।

বয় খাবার দিয়ে যায়। চায়ের কাপটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে মুরগীর রোষ্ট আর নানরুটি অনুর দিকে এগিয়ে দেয় প্রেমাংশু।

অনু ঠোঁটের কোনে চোরা হাসি তোলে, 'একি তুমি খাবে না?'

'নাহ.'। —অম্বুর এই তির্যক হাসিটুকুই মারাত্মক। গভীরে ঢুকে যায়। বলতে গিয়ে স্বরভঙ্গ ঘটে প্রেমাংশুর 'পেটটা ভার ভার লাগছে।'

মনে মনে নিজেকে নিজে ধমকাতে থাকে। আহাম্মক আর কাকে বলে। অম্বু প্রায়ই একটা কথা বলেঃ তুমি তো সব সময় ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে আছো। উঠল বাই তো কটক যাই। ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় কোন কাজ করা তোমার স্বভাবে নেই।—কথাটা ঠিক। এতটা হুড়োহুড়ি করার দরকারটা কি ছিল। সত্যি যদি ভেতরে ভেতরে শেকড়বাকড় অনেকদূর পর্যন্ত চারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এত তাড়াতাড়ি টিউমারটাকে খোঁচাখুচি না করলেই ভাল হত। প্রেমাংশু বিলক্ষণ জানে, এ জাতীয় ঘা একবার কাটাছেঁড়া করলেই হু-হু করে বাড়তে থাকে।

রোস্টের অর্ধেকটা আর একটা নানরুটি ছোট প্লেটে তুলে প্রেমাংশুর দিকে এগিয়ে দেয় অম্বু। বলে, 'নাও, একটু তুমি খাও—'

প্রেমাংশু অম্বুর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে থতিয়ে যায়। প্রতিবাদ করতে পারে না।

বাড়ি ফিরে যতটা পারে নিজের হাতে করে প্রেমাংশু। হাতমুখ ধুতে গিয়ে চৌবাচ্চায় কয়েক বালতি জল তুলে রাখে। যা লোডশেডিং। ঘরে এসে বিছানা পাতে। শুকনো কাপড় আলনায় রাখে। টেবিলের কাগজপত্র গুছোয়। ঝিমলিকে পড়াতে বসে। ওদিকে কুসুম রান্নাঘরে। দুপুরের দিকে একবার সময় করে ও বাড়িতে গিয়ে বলে এসেছে। আজ ফিরবে না।

অনেকদিন বাদে এ-ঘরে বেডলাইট জ্বলে। রাত ক্রমশ গভীর হয়। অম্বু ঝিমলি ঘুমে কাদা। শুধু প্রেমাংশু এপাশ-ওপাশ করে। মাথায় রাজ্যের ভাবনা। হঠাৎ দূরে কামানের গর্জনের মত মেঘের আওয়াজ জেগে উঠতে চমকে উঠে বসে সে। হাঁটুতে ভর দিয়ে অম্বুর দিকে ঝোঁকে। নীলচে আলোয় অম্বুর মুখটা বড়ই করুণ, বিষণ্ন লাগে। ফিসফিস করে ডাকে প্রেমাংশুঃ অম্বু, এই অম্বু···

অম্বু উত্তর করে না। ঘুমের মধ্যে দেউলা কাটে। অম্বুর ঠোঁটের কোনে

হাসির রেখা। প্রেমাংশুর হৃৎপিণ্ডে কেউ যেন সজোরে ধাক্কা মারে। অনু মাঝে মধ্যে একটা কথা বলে : আমি যেদিন থাকব না সেদিন বুঝতে পারবে। প্রেমাংশুর শরীরের অণুপরমাণুতে বিস্ফোরণ ঘটে। শ্বাসকষ্ট বোধ হয়। মশারির বাইরে চোখ ফেরায় সে। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকায়। ঘড়িটা চলছে না। বন্ধ। অনু চাবি দিতে ভুলে গেছে। হঠাৎ বাইরে বিদ্যুতের ঝলকানি। কড়কড় শব্দে দূরে কোথাও বাজ পড়ে। বেড-সুইচটা আচমকা দপ্ করে নিভে যায়। অন্ধকারে ডুবে যায় ঘর।

পরদিন অফিসে গিয়ে কিছুতেই মন বসাতে পারে না প্রেমাংশু। টাইপ করতে বসে শুধুই কাগজ নষ্ট করে। লেজারে হিসেব তুলতে গিয়ে বার-বার ভুল হয়। বেশিক্ষণ একঠায় চেয়ারে বসে থাকতে পারে না। উঠে বাথরুমে যায়। করিডোরে গিয়ে দাঁড়ায়। নিচের চলমান জনস্রোতের দিকে অর্থহীন তাকিয়ে থাকে।

নার্সিংহোমের ভেতরে ঢুকে দু'নম্বর কাউন্টারের কিউ-তে দাঁড়ায় প্রেমাংশু। ফোলিও ব্যাগের ভেতর থেকে রিসিটটা বের করে। সামনে জনাতিনেক লোক। প্লাইউডের চৌখুপির ফুটো থেকে খামটা টেনে নেবার সময় প্রেমাংশুর হাতটা অস্বাভাবিক কাঁপতে থাকে। যেন নিজের মৃত্যু পরোয়ানা হাতে তুলে নিচ্ছে, এইরকম ভাব।

ঝুলন্ত আলোর নিচে এসে দাঁড়ায় প্রেমাংশু। খামের ভেতর থেকে রিপোর্টটা বের করে। বড় একটা কাগজে সবুজ কালিতে টাইপ করা কতগুলি অক্ষর। ডাক্তারি পরিভাষায় লেখা। শুধু শেষের দিকের একটা শব্দ বুঝতে পারে। ক্যাপিটাল লেটারে লেখা রয়েছে—'নেগেটিভ।'

প্রেমাংশু আরো নিশ্চিত হতে চায়। একটু ভাবে। তারপর এগিয়ে যায় ভেতরের দিকে। বাঁ ধারের একটা ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই ঘরটাতেই কাল অনুর পিঠের গোটা থেকে মাংস কেটে নেওয়া হয়েছিল।

ভেতরে একজন লোক। চেয়ারে বসে। সাদা এ্যাপ্রন পরা। প্রেমাংশু হুট করে ঢুকে পড়ে রিপোর্টটা এগিয়ে ধরে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে, 'কাইগুলি যদি একটু বুঝিয়ে দেন। ঠিক ধরতে পারছি না।'

লোকটা মুখ তোলে। কপালের রেখায় বিরক্তি। কিন্তু উস্কখুস্ক প্রেমাংশুর দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে রিপোর্টটা টেনে নেয়। টেবিল ল্যাম্পের সামনে ধরে বার দুই দেখে। তারপর বলে, 'ভয়ের কিছু নেই। সিস্‌টিক গ্রোথ—'

'মানে?'—একটু জোরেই বলে ফেলে প্রেমাংশু।

'সাধারণ একটা টিউমার। এই আর কি।'—লোকটা হাসে, 'মলমটলম লাগান। সেরে যাবে।'

নার্সিংহোম থেকে বেরিয়েই মনে মনে চক্রবর্তীকে গালাগালি দিয়ে ওঠে প্রেমাংশু। শ্লা, হাতুড়ে ডাক্তার—

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অনু ঝিমলির চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। বড় খাটে নীলু। বইখাতা নিয়ে পড়ছে। পরশু থেকে ছেলেটা আরো চুপচাপ। কেমন যেন থম্ মেরে আছে। রান্নাঘরে কুসুম। হঠাৎ প্রেমাংশুর চিৎকার, 'অনু—'

অনু চিরুণীটা ফেলে উঠে পড়ে। ততক্ষণে ওধারের প্যাসেজ দিয়ে রান্নাঘরের মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে প্রেমাংশু। হাতে একটা নতুন থলি। ভর্তি বাজার। প্রেমাংশু বলে, 'অনেকদিন বাদে চিতলের পেটি পেয়ে গেলাম। কিছু চিংড়িও এনেছি। কতকাল চিতলের কালিয়া খাই না। আর সেই সঙ্গে শোলাকচু দিয়ে মাখামাখা চিংড়ি মাছের ঝোল। বেশ জম্পেশ করে রাঁধবে কিন্তু—'

ততক্ষণে নীলু মার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাজারের থলিটা কুসুমের হাতে তুলে দিয়ে বাথরুমের দিকে চলে যায় প্রেমাংশু। একটু বাদেই শোনা যায় গর্জন, 'সাবান কোথায়। মগটাও দেখছি নেই। এটা কি বাড়ি, না—'

নীলু টানটান হয়ে দাঁড়ায়। অমু বোঝে এই প্রথমবার ফুঁসে উঠবে নীলু। সে ছেলের একটা হাত ধরে ফেলে, 'তোর আবার কি হল?'

'যাই বলো মা, বাবার এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।'—রাগে কাঁপতে থাকে নীলু। অমু কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব খুশি। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠলে যেমন হয়। পুরো দু'দিন বাদে আবার স্বাভাবিক লাগছে মানুষটাকে। চাপা ধমকের সুরে বলে, 'তুই ঘরে যাতো। আমি দেখছি—'

তারপর অমু পিঠের ব্যথা নিয়েই এগিয়ে যায় বাথরুমের দিকে।

## ছবি

হাতে টাউস চামড়ার ব্যাগ। শার্টের হাতাত্বটো অসমানভাবে গোটানো। চুলে ঠিকমত চিরুণী পড়েনি। ওধারের গলি থেকে বেরিয়ে ব্যস্তসমস্ত অনিন্দ্য ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে আসছিল।

বেরুবার কথা সকাল আটটায়। জনাপাঁচেক বাঘা বাঘা ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ছিল। কপাল খারাপ। তিন তিনটে পেনকিলার গিলেও কাল সারারাত ছটফট করেছে। ব্যথা কমেছিল ভোরের দিকে। তারপর যা হয়। ছুচোখের পাতা ভারি হয়ে গেল। ঘুম চটতে বেলা সাড়ে দশটা।

এধারের ফুটপাতে উঠে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল অনিন্দ্য। সামনের দোকানের শো-কেসে মস্ত এক শিশুর মুখ। মাউণ্ট বোর্ডে নিকেলের পিন দিয়ে সাঁটা। ফোলা ফোলা নরম তুলতুলে গাল। বড় বড় ছুটো চোখ। কমলালেবুর কোয়ার মত টসটসে ছুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হাসি ঠিকরে বেরুচ্ছে।

কলেজ স্ট্রীট, বউবাজার ধর্মতলা···।—টার্মিনাসে একটাই মিনিবাস দাঁড়িয়ে। পরিচিত যাত্রী দেখে কণ্ডাক্টর হাঁক পাড়ল।

আচমকা বিহ্বল অনিন্দ্য। ফটোটা থেকে সে চোখ ফেরাতে পারছিল না। সেই সঙ্গে বুকের ভেতর একটা মৃত্থ কম্পন। শেষ পর্যন্ত সে শো-কেসের দিকে এগিয়ে গেল।

'আশ্চর্য!' —নিজের অজান্তেই মুখ থেকে খসে পড়ল শব্দটা। অবিকল সেই মুখ, হাসি, মায়াকাড়ানো চাউনি। এমন কি কপালের চন্দনফোঁটা, চোখের কাজলরেখা পর্যন্ত।

বিশ্রী শব্দ করে মিনিবাসটা ষ্টার্ট নিতে নিজের মধ্যে ফিরে এল অনিন্দ্য। লালায় ভিজে ওঠা সিগারেটটা রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে হাতঘড়িতে চোখ রাখল। ডাক্তারবাবুর চেম্বার ওয়েলিংটনে। আর মিনিট কুড়ির মত সময় আছে। চিন্তাটা মগজে ধাক্কা মারতেই সে ছুট লাগাল।

সীটে বসে বড় করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে আশ্বস্ত বোধ করল অনিন্দ্য। অহেতুক সেন্টিমেন্টাল হবার কোন অর্থই হয় না। সাত বছর আগে তোলা গোলপার্কের কাছের এক ফটোর দোকান থেকে এতদিন বাদে ফটোটা এতদূরে এসে শোভা পাবে এটা ভাবা মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এসে জ্যাম-এ পড়ায় বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হল। ফলে ডাক্তার রুদ্রকেও ধরা গেল না। জ্যৈষ্ঠের শুরু। আকাশ আগুন ঢালছে। একে একে সব কটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট কেঁচে যাওয়ায় কিছুটা দমে গেল অনিন্দ্য। বেলা বারোটার কাছাকাছি। এ সময় গিয়ে কোথাও যে দু'দণ্ড কাটাবে তারও উপায় নেই। অগত্যা সে গণেশ এভিন্যুতে ঢুকে একটা ট্যাক্সি ধরল।

হেড অফিস লিটল র‍্যাসেল স্ট্রীটে। ট্যাক্সি হ্যারিংটন স্ট্রীটের কাছে আসতে সুপারভাইজার দত্তর থমথমে মুখটা ভেসে ওঠায় সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল অনিন্দ্য। শরীরটা কমজোরি হয়ে পড়ায় মাস দুয়েক হল সে কম্পানীকে ভাল বিজনেস দিতে পারছে না। সেকথা দত্ত তাকে ইতি-মধ্যেই বারকয়েক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং বেটাইমে অফিসে ঢু মারা মোটেই বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে না। অনিন্দ্য সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, 'সোজা চলুন।'

'কোথায় যাবেন স্যার?'—ড্রাইভার শুধোল।

'ঠাকুরপুকুর।'—হঠাৎই অনিন্দ্যর মুখ থেকে বেরিয়ে এল কথাটা।

ট্যাক্সি এগিয়ে ডাইনে ঢুকল। পাশে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম। তার

ওধারে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস। অনিন্দ্যর মনে পড়ে গেল—ওই একাডেমিতেই উনষাট সালের মার্চ মাসে এক ভাঙা বিকেলে দীপার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। ওখানে তখন বন্ধু সলিলের একজিবিশন চলছিল। দীপা সলিলের দূর সম্পর্কের বোন। একজিবিশন আওয়ার শেষ হলে ওরা তিনজন এক সঙ্গে বেরিয়েছিল। আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ। হাওয়া বইছিল জোর। ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় ওরা ময়দানের ভেতর দিয়ে হেঁটে ধর্মতলায় পৌঁছে এক চায়ের দোকানে ঢুকেছিল। সেদিনের আলাপের সূত্র ধরেই ক্রমশ অনিন্দ্যর সঙ্গে দীপার হৃদ্যতা। তারপর মাসকয়েক বাদে হুট করে একদিন তাদের রেজিস্ট্রিও হয়ে গিয়েছিল!

বাইরের দিকে চোখ ফেরাল অনিন্দ্য। দুধারে নানা মাপের বাড়ি, গ্রীষ্মের দুপুরে ঘুমন্ত। মানুষের সাজানো সংসার। বিয়ের পর তাঁদেরও দুটো বছর চমৎকার কেটেছিল। সে আর দীপা, মাঝখানে ছোট্ট বাপ্পা। সুখের এক বিচিত্র আস্বাদ ছিল সেই জীবনে। তারপর হঠাৎ করেই বিগড়োতে শুরু করেছিল দীপা। অনিন্দ্য তখন যাদবপুরের দিকে এক হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের সায়েন্স টীচার। বাড়িভাড়া দেড়শ, ফুলটাইম ঝি—যা মাইনে পেত তাতে কুলোবার কথা নয়। তারপর বাপ্পা হতে খরচ আরো বেড়ে গিয়েছিল। শেষে বাধ্য হয়ে বাড়িতে কোচিং খুলেছিল। আর সেটাই হয়েছিল কাল। পাশের বাড়ির মেয়ে রুমা পড়তে আসত তার কোচিং-এ। এগারো ক্লাশের ছাত্রী। দেখতে শুনতে ভাল। তার ওপর খুব হাসিখুসি আর প্রাণবন্ত। ওকে অকারণ সন্দেহ করতে শুরু করল দীপা। অশান্তি ঢুকল সংসারে। দীপার এই মানসিক বিকারের কারণটা যে অনিন্দ্য ধরতে পারেনি এমন নয়। বড়-লোকের আদুরে মেয়ে। এক কথায় অনিন্দ্যর হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ফলে অনিন্দ্যর ওপর দীপা অধিকারবোধটা ছিল বেপরোয়া ধরনের। কোন মেয়ে অনিন্দ্যকে নরম চোখে দেখুক এটুকুও সহ্য করতে পারত না দীপা। অনিন্দ্য অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা

করেছে। কিছুদিন বাদেই রুমার ফাইনাল পরীক্ষা। আর পাঁচজনকে যখন সে পড়াচ্ছে তখন রুমাকে একলা আসতে বারণ করবে কোন অজুহাতে। দীপা তার কোন কথাই কানে তোলে নি। খিটিমিটি ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। শেষে একদিন দীপার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে পাড়ার লোক জড়ো হল। রুমাকে ও যাচ্ছেতাই অপমান করল। সবাই চলে গেলে সেদিন আর অনিন্দ্য নিজেকে শাসনে রাখতে পারে নি। দরজার খিল এঁটে দীপার গালে সজোরে একটা চড় কসিয়ে দিয়েছিল।

নাইকুণ্ডলীর ঠিক ওপরে ব্যথাটা ঘাই মারছে। জিভ ক্রমশ টকে উঠছে। একটা সিগারেট ধরাল অনিন্দ্য। সেদিন বিকেলের দিকে স্কুল থেকে ফিরে দেখে দীপা ঘরে নেই। দুপুর দুপুর বাপ্পাকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। অনিন্দ্য দিন কয়েক হাত গুটিয়ে অপেক্ষা করছিল। ভেবেছিল—নিজের ভুল বুঝতে পেরে শেষমেশ একদিন ঠিকই ফিরে আসবে দীপা।

ট্যাক্সি বেহালা বাজার ছাড়াচ্ছে। আকাশে এক পরত কোদালে মেঘ। রোদের ঝাঁঝ অনেকটা কমেছে। তলপেটে ডান হাতটা আলতো করে চেপে ধরে সীটে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজল অনিন্দ্য। দীপা আর আসেনি। তারপর আর ওর সঙ্গে দেখাও হয়নি কখনো। মেয়ে জাতটাকেই সে আর বিশ্বাস করে না। হৃদয়হীনতার জুড়ি নেই ওদের। শেষে মাস দেড় দুই বাদে মাথা হেঁট করে অনিন্দ্যই ওদের ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল। ততদিনে দীপা বাপ্পাকে নিয়ে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এক আবাসিক আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার কাজ নিয়ে। লজ্জায় অপমানে সেদিন মুখ কালো করে ফিরে এসেছিল অনিন্দ্য। প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল আত্মসম্মানে। বন্ধুরা সব শুনে তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করতে বলেছিল। অনিন্দ্যও একবার ভেবেছিল লড়ে যাবে। বাপ্পাকে ছিনিয়ে নিয়ে দীপার নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত জবাব দেবে। তার জন্যে তাকে কম মূল্য দিতে হয় নি। স্কুল মাষ্টারি ছেড়েছে। ঢাকুরিয়ার বাসাবাড়ি তুলে দিয়ে আগলবাগল ঘুরে বেরিয়েছে লক্ষ্যহীন

ধূমকেতুর মত; কোথাও শান্তি পায়নি। এক অসহনীয় শূন্যতাবোধ তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। শেষে এক ওষুধ কম্পানীর চাকরি নিয়ে সুদূর আসামে পাড়ি জমিয়ে মুক্তি পেতে চেয়েছে।

ঠাকুরপুকুর বাসস্টপ থেকে আশ্রমে পৌঁছতে মিনিট দশেক সময় লাগল। দীপা কোয়ার্টারে ছিল না। বুড়ি-ঝি অনিন্দ্যকে বসতে বলে বেরিয়ে গেল। ছোট বসবার ঘর। পরিপাটি করে সাজানো। দেয়ালে উড়ন্ত কাঠের পাখির ঝাঁক। অ্যাকোরিয়ামে রঙীন মাছের সঞ্চরণ। রংদার জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে মানিপ্ল্যাণ্টের ডগা উঁকিঝুঁকি মারছে। সেণ্টার টেবিলে বড় একটা তরমুজ রঙের ভাস। তাতে গন্ধরাজের তোড়া। ঘরের এককোনে কাচের আলমারি। সেদিকে চোখ পড়তে এগিয়ে গেল অনিন্দ্য। আলমারির মাথায় একটা ফটোস্ট্যাণ্ড। তাতে একটা হাফ সাইজের ফটো। বাঃ৷ার, হালআমলের। পায়ে কেডস। মাথায় শোলার হ্যাট। গায়ে নিকারবোকার। হাতে উদ্যত ব্যাট। মুখে চাপা হাসি। অনিন্দ্য ঝুঁকে পলকহীন চোখে যেন নিজের ছেলেবেলাকে দেখতে লাগল।

কে?—ধারালো ছুরির ফলার মত দীপার কণ্ঠস্বর কানের পর্দায় আঘাত হানলে ঘুরে দাঁড়াল অনিন্দ্য। দরজার পাল্লায় হাত রেখে যেন ছবি হয়ে গেছে দীপা। পরনে লালপাড় সাদাখোলের শাড়ি। নিপট কপাল। ঘামে চকচকে মুখ। আগের তুলনায় অনেক রোগা লাগল দীপাকে।

আমি।—অনিন্দ্য বলল।

এক পা এগুল দীপা, হঠাৎ—

এস্নি—

আমি যে এখানে আছি এ সংবাদটা কে দিল?—আঁচলের কুচি ঠিক করে নিয়ে তাপহীন হাসল দীপা।

কেউ নয়, অনেকটা অনুমান বলতে পারো।—টাইয়ের নটে আঙুল রেখে

সপ্রতিভ হতে চাইল অনিন্দ্য, বসতে বলছ না যে। দাঁড়িয়ে থাকব নাকি ?

না-না, তা কেন।—নড়ে চড়ে উঠল দীপা।

তুজনে মুখোমুখি চেয়ারে বসল। বুড়ি-ঝি চা দিয়ে গেল। দেয়ালে হাল্কা ছায়া। দীপার চোখ ভাসের দিকে। কয়েক মুহূর্তের দমচাপা ভারি নীরবতা। অনিন্দ্য অনুভব করল—হঠাৎ করে এভাবে এখানে এসে পড়াটা ঠিক হয়নি তার পক্ষে।

দীপা একসময় প্রশ্ন করল, আসাম থেকে করে ফিরলে ?

গত বছর,—চায়ের কাপে চুমুক দেবার আগে বলল অনিন্দ্য, জুলাই'র এণ্ডে—

এতদিন !—তুই ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ ফেলল দীপা।

হ্যাঁ, কম করে আরো বছর তুই কলকাতাতেই থাকব।—অনিন্দ্য লক্ষ করল তখনো দীপার দৃষ্টি ভাসের দিকে।

এদিকে কোথায় এসেছিলে ?—চায়ের কাপ তুলে নিচ্ছে দীপা।

ঢং ঢং করে কাছাকাছি কোথাও ঘণ্টা বেজে উঠল।

এদিকে মানে—আলমারির দিকে চোখ ফেলে বলল অনিন্দ্য, অফিসের কাজে এসেছিলাম।

অফিসের কাজে ঠাকুরপুকুরে!—দীপার কণ্ঠস্বর বেসুরো। অনিন্দ্য বাপ্পার ফটোটা জরিপ করছিল। বলল, হ্যাঁ বিশ্বাস হচ্ছে না ?

অদূরে শিশুদের কলরব শোনা যাচ্ছে। হয়তো হাসলো দীপা, না বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে। আবার কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। চায়ের কাপ শূন্য করল অনিন্দ্য।

এবার আমায় উঠতে হবে।—এই প্রথম চোখাচোখি হল। পাথরের গুলির মত ব্যঞ্জনাবিহীন দৃষ্টি। মুখে কঠিন হাসি দীপার, টিফিন শুরু হয়ে গেছে।

বাপ্পা কোথায় ?—অনিন্দ্যর ভেতর একটা অস্বস্তি চলকাচ্ছে।

স্কুলে।

ও কোন্ ক্লাসে পড়ে ?

ওয়ান—

একবার ওকে এখানে নিয়ে আসা যায় না।—খানিকটা গরম হাওয়া বেরিয়ে এল অনিন্দ্যর কণ্ঠনালী থেকে।

এতদিন বাদে—দীপা নড়েচড়ে উঠল, হঠাৎ বাপ্পার কথা মনে পড়ল-এসে যখন পড়েছি—,ইচ্ছে করেই কথাটা অসমাপ্ত রাখল অনিন্দ্য।

তবু ভাল, ঠোঁটে ঠোঁট ঘষল দীপা, এদিকে এসেছিলে তাই। নইলে—

একবার তোমার ঝিকে পাঠিয়ে দাও না।—দীপাকে কথা শেষ করতে দিল না অনিন্দ্য।

আশ্রম-স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে বাড়িতে আসার নিয়ম নেই।—দীপার মুখের রেখা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

ঠিক আছে—,পাশ থেকে চামড়ার ব্যাগটা তুলে নিল অনিন্দ্য, চলো, তোমার সঙ্গেই যাই। স্কুলে গিয়ে নাহয়—

তা হয়না।

কেন ?

এত বছর বাদে সকলের সামনে তোমার কি পরিচয় দেব ?—দীপা উঠে দাঁড়াল।

বাবুঘাটের কাছাকাছি এসে বাস থেকে নেমে পড়ল অনিন্দ্য। গঙ্গার ওপর থেকে আধখানা গেরুয়া মেঘের ঢাল নিবিড় হয়ে ওপারের দিকে নেমে গেছে। সূর্যবিহীন বিকেলের নিভন্ত আলোয় চারদিক মলিন। এলোমেলো সজল হাওয়া জানান দিচ্ছে এদিকে কিছুক্ষণ আগে ঝরে গেছে এক পশলা। ভিজে মসৃণ পাথুরে রাস্তা। অনিন্দ্য হেঁটে কার্জন পার্কের উত্তরদিকে চলে এল। এখন তার শরীরে কোন অস্বস্তি নেই। দারুণ উত্তেজনার শেষে যেমনটা হয়। ক্লান্ত, সম্পূর্ণ ধ্বস্ত শরীর-মন। স্নায়ুগুলো অসাড়।

ট্রামগুমটি ছাড়িয়ে ফুটপাতের কাছাকাছি এসে একটা বকুল গাছের ঝুপসির নিচে এসে দাঁড়াল অনিন্দ্য। পরপর কয়েকটা কাঠি জ্বালিয়েও

সিগারেট ধরাতে পারল না সে। অগত্যা উদ্দেশ্যবিহীন সামনের রাস্তার যানবাহনের চলাচলের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। শেষে এক সময় বড়রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের গলির ভেতর ঢুকে পড়ল।

বাদলার দিন। সন্ধ্যা উৎরোবার আগেই মদের দোকান জমজমাট। অনিন্দ্য ডানদিকের হলঘরে ঢুকে গিয়ে একটা চেয়ার দখল করল। ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে মদের অর্ডার দিল।

মেয়েটি এল খানিকবাদে। ততক্ষণে সোডা ছাড়াই দুটো পেগ গলায় চালান করে দিয়েছে অনিন্দ্য। মেয়েটি পাটাতনে উঠে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বয়স চব্বিশ পঁচিশের মধ্যে। বেশ লম্বা আর ছিপ-ছিপে। মুখে হাল্কা পাউডারের প্রলেপ। শ্যাম্পু করা বব্‌ড চুল। পরনে আঁটোসাটো করে জড়ানো একটারংবাহার শাড়ি। মেয়েটি মৃদু হেসে নগ্ন দুহাত শূন্যে তুলতেই রক্তপাগলকরা বাজনার শব্দে হলঘর গম গম করে উঠল।

শরীরটা অনেক ঝরঝরেলাগছে। ফের অনিন্দ্য বেয়ারাকে ডাকল। মেয়েটি একটা চটুল ফিল্মি গান ধরেছে। বাজনা ধীরে ধীরে চড়া পর্দায় উঠছে। মেয়েটির চোখে কটাক্ষ মুখে চিকোন হাসি, দেহে বিদ্যুতের ঝলকানি। ক্রমশ মেয়েটি সাপিনীর মত ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। অনিন্দ্য ঝুঁকে ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খেলা দেখতে দেখতে ভাবতে লাগল: দীপার চেয়ে অনেক সুঠাম, অনেক লোভনীয় দেহ।

একসময় ওঠে দাঁড়াল অনিন্দ্য। তার সারা শরীরে এক দারুণ আক্রোশ দাউদাউ করে জ্বলছে। সে স্খলিত পায়ে এগিয়ে গিয়ে কাঠের পাটাতনে উঠে পড়ল। তারপর মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিল। আর তখন সামনের সবুজ আলো অন্ধকার থেকে দমকে দমকে এলোমেলো চিৎকার এসে আছড়ে পড়তে লাগল পাটাতনের ওপর। শেষে, যতদূর মনে আছে অনিন্দ্যর, দুজন বেয়ারা ছুটে এসে তাকে ধরাধরি করে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

## ছবি

রাত প্রায় বারোটা। অনিন্দ্য গোটাকয়েক লাথি কষাতে চাকর যদু এসে মেসবাড়ির সদর দরজা খুলে দিল। অনিন্দ্যর ঘর তেতলায়। তার মাথার ভেতর তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরপাক খাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে সে টলতে টলতে চাতাল পার হল। বোর্ডাররা সব শুয়ে পড়েছে। অনিন্দ্য সিঁড়ির কাছাকাছি পেঁছুতে পেছন থেকে যদু বললে, ধরব বাবু—

চোপরও উল্লুক।—গর্জে উঠল অনিন্দ্য। খোলা সিঁড়ি, বৃষ্টিতে পিছল। খাড়াই ভাঙতে কষ্ট হচ্ছিল তার। কিছুটা উঠে যাবার পর হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। পেটে নয়, সম্ভবত বুকে কিংবা শরীরের অন্য কোথাও একটা অসহ্য ব্যথা মুচড়ে উঠে তার শিরদাঁড়াকে বাঁকিয়ে দিচ্ছিল। সিঁড়ির ভাঙাচোরা ধাপগুলো ঠাহর করতে পারছে না অনিন্দ্য। তার ঝাপসা চোখের সামনে আস্তে আস্তে একটা, দুটো ছবি ফুটে উঠছে। আসলে সেসব মানুষের মুখ। যাদের সে ভালবাসে। বাপ্পা আর দীপার।

একটা বিকট চিৎকার করে ফের অনিন্দ্য সামনের অনির্দেশ্য অন্ধকার ভাঙতে ভাঙতে টালমাটাল পায়ে ওপরের দিকে উঠে যেতে লাগল।

## টানাপোড়েন

খুব ভোরে সরোজকান্তি স্বাতীর ঘরের কাছে এসে খাটোগলায় যথারীতি ডেকেছিলেন, বউমা, বউমা···

বছর দেড়েক হতে চলল এ সংসারে পা দেবার পর রোজই প্রতিদিন একই সময় সরোজকান্তির গলায় সাড়া পেয়ে স্বাতীর ঘুম ভাঙে। উঠে চোখেমুখে জল ছিটিয়ে নিয়েই সে স্টোভ ধরায়। লাঠি জামা জুতো জুগিয়ে রাখে। সরোজকান্তি প্রেসারের রুগী। অন্ধকার থাকতে বিছানা ছাড়েন। গরম চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তাজা আলো-বাতাসের সন্ধানে। আজই প্রথম ব্যতিক্রম ঘটল। সরোজকান্তির ডাকে ঘুম ভাঙেনি স্বাতীর।

চোখ মেলতে স্বাতী দেখল মাথার ওপর সিলিং ফ্যানটা নিঃশব্দে ঘুরছে। বাতাসে ঘামঘাম ভাব। জানালার খড়খড়ি দিয়ে কয়েক পরত রোদ মশারির গায়ে নেমে ছটফটাচ্ছে। পাশে ঝুমা নেই। সমীর চলে যাবার পর প্রথম দিকে মাস কয়েক অমলা স্বাতীর সঙ্গে শুতেন।

দরজাটা আধখোলা। তারপর বারান্দা ছাড়ালে বাঁধানো উঠোন। উঠোনে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে মুখে 'হুস-হুস' শব্দ তুলে চাল ছড়াচ্ছেন অমলা। গত বৈশাখের পর হঠাৎ করে অস্বাভাবিক ভাবে শরীরটা ভেঙে গেছে অমলার। তার ডাকে ছাদের কার্নিশ থেকে একে একে ডানা দাবড়ে নেমে আসছে সমীরের পোষা পায়রার দল।

# টানাপোড়েন

কনুইয়ে ভর রেখে স্বাতী উঠে বসল। শরীরের ফাঁকফোকরে হাজার তারাবাজি ফুটছে। হাতের আঙুল দিয়ে চোখ ডলতে জ্বালা ধরল। চাল ধোওয়া জলের মত ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে আছে ঘরময়। মাথার ভেতর অসংখ্য ভাঙা কাচের টুকরোর ঠোকাঠুকি। পরপর বেশ কয়েকটা ঘুমের বড়ি গিলেও কাল অনেক রাত অব্দি দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি স্বাতী।

বৈশাখের সকাল। বাইরে আঠার মত ঘন রোদ। স্বাতীকে বারান্দায় নেমে আসতে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল অমলা। পা দুটো অল্প টলছে। কপালে লেপ্টে থাকা চুলের ভাঁজ সরিয়ে নিতে নিতে শুধলো স্বাতী, বাবা ফিরেছেন?

অমলার পায়ের কাছে একটা দুধসাদা লক্কা পায়রা। নির্ভয়ে খুঁটে খুঁটে ঠোঁটে চাল তুলছে। জাপানি পাখার মত মস্ত ঝুঁটি। দু'পায়ে দুটো ছোট রূপোর মল বাঁধা। শিয়ালদার রথের মেলা থেকে ওটা কিনে এনেছিল সমীর। অমলা মাথা নেড়ে জানালেন, না।

বারান্দা ধরে সোজা এগিয়ে গেলে ডাইনে প্যাসেজ। প্যাসেজের প্রান্তে বাথরুম। ভেতরে ঢুকে ছিটকিনি তুলে দিল স্বাতী। জলের টাপ খুলল। সারা শরীরে একটা আঁশটে ভাব। বেসিন থেকে কুচো কুচো জলকণা ছিটকে উঠে লেগে যাচ্ছে আয়নার কাচে। সেদিকে দৃষ্টি ফেলল স্বাতী। চোখদুটো ফোলা ফোলা। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার পর যেমন হয়। সারা মুখে একটা কালচে ছায়া নেমেছে। নিজের কাছে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে দৃষ্টি নামিয়ে দু'হাত ভরে জল তুলে মুখে ছিটোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্বাতী। সাড়ে সাতটার ডাউন বারুইপুর লোকাল চাপা গোঙানির মত আওয়াজ তুলে মাটিতে চিরুণী চালিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে নিরেট দেয়ালের আড়াল। স্কাইলাইটে খানিকটা ঘোলাটে আলো ঝুলছে। আয়নার কাচে আরেক নারীর মুখ। পায়ের তলায় সর্পিল জলের রেখা। গায়ে শীতকাঁটা দিয়ে উঠল স্বাতীর। নাইট ডিউটি থাকলে এই ট্রেনে করে ফিরত সমীর।

বাথরুমের বাইরে ঝুমা দাঁড়িয়েছিল। বইখাতা নিয়ে। স্বাতী বেরুতে বলল, কাল আমার উইকলি টেস্ট। ভূগোল পড়াটা একটু বুঝিয়ে দেবে বৌদিভাই।—লেখাপড়ায় ঝুমার খুব ঝোক। সমীরেরও ছিল। মা-বাপ মরা মেয়ে স্বাতী। মামাদের সংসারে মানুষ। স্কুলের গণ্ডী পেরুবার পর তাই আর সে কলেজে পড়ার সুযোগ পায়নি। দ্বিরাগমনের পালা চুকিয়ে বাড়ি ফিরেই সমীর বলেছিল, ঘরে শুয়ে বসে গড়িয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয়না। তার চেয়ে বরং সামনের বছর পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় বসে পড়ো। সেকথায় মৃদু প্রতিবাদ জানিয়েছিল স্বাতী। ঘরে শ্বশুর শাশুড়ী। নতুন সংসারে পা দিতে না দিতেই বইখাতা নিয়ে বসা। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু দেখায়। কিন্তু সমীর নাছোড়বান্দা। পরের দিনই কলেজ স্ট্রীট পাড়া চঁুড়ে বইপত্তর কিনে নিয়ে এসেছিল।

মাথার ভেতর রক্তচাপ চলকাচ্ছে। ভেতর থেকে শাঁসটুকু বের করে নিলে যেমন হয় তেমনি শ্রান্ত ভাব। তবু ঝুমার দিকে চোখ পড়তে বুকটা মুহূর্তে টলটলে হয়ে উঠল। অবিকল সমীরের ছাঁচে গড়া মুখ। পাতলা ঠোঁটে চাপা হাসি। দুষ্টুমিভরা চাউনি। চিবুকের ভাঁজটুকু পর্যন্ত একই রকম। স্বাতী বলল, তুই গিয়ে বাইরের ঘরে বোস। আমি আসছি—

রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে শুধোলেন অমলা, সকালের জলখাবার কী হবে বউমা ?

স্বাতী একটু ভাবল। আজ তার কেমন উদাস উদাস ভাব। বলল জবাবে, রোজ এক জিনিস। আজ লুচি-তরকারি হলে কেমন হয় মা ?—সাধারণত মাখন-রুটি আর কলা দিয়ে ব্রেকফাস্ট হয়। গরম পড়লে ঘরে-পাতা দই আর চিড়ে। ভাজাভুজি খুব পছন্দ সরোজকান্তির। কিন্তু লিভার কমপ্লেনে ভুগছেন তিনি। সরোজকান্তির শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কড়া নজর স্বাতীর। তাই অবাক হলেন অমলা। হেসে বললেন, তোমার যা ইচ্ছে।

ঘরে এসে আলমারি খুলল স্বাতী। রান্নাঘর থেকে লক্ষ্মী এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। পাশেই মুদীদোকান। টুকিটাকি মশলাপাতি কিনতে যাবে। টাকা বের করে লক্ষ্মীকে দিল স্বাতী। সরোজকান্তির পেন্সনের টাকাতেই ছোট সংসার মোটামুটি চলে যাচ্ছে। এছাড়া সমীরের গচ্ছিত হাজার কয়েক টাকা রয়েছে। সেটা ভাঙতে দিতে চান না অমলা। বলেন, ওটা থাক বউমা।

অমলার আপত্তির কারণটা বোঝে স্বাতী। এমন একটা সময় আসবে যখন এ সংসারে কেউ থাকবে না। ঝুমার বিয়ে হয়ে যাবে। বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ি গত হবেন! তখন এই অমলা লজে একলা সে। ভাবতে বুকের ভেতরটা গহ্বরের মত শূন্য হয়ে যায়।

চুলে চিরুণী গেঁথে বাসি কাপড় ছাড়ল স্বাতী। জানালার ওধারে একসার পেঁপেগাছ। গাছগুলো পুঁতেছিল সমীর। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফল দিচ্ছে। সকালের একমুখো হাওয়ায় পেঁপে পাতা কাঁপছে শির শির করে। তারপর পাঁচিল। পাঁচিলের ওধারে প্রগতি সংঘের মাঠ। একসময় সমীর ছিল প্রগতি সংঘের সভাপতি। মাঠের শেষে রেলস্টেশন।

হাওয়ায় ক্যালেণ্ডারের পাতা নড়ছে। উজ্জ্বল আলোয় ঘরের সবকিছু ঝলমল করছে। গত রাতের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে গেলে থই পায় না স্বাতী। কাল রাতে এই ঘর ছিল কি ভয়ংকর! যেন এক শ্বাসরুদ্ধকর আদিম গুহা। বিছানায় কাদা হয়ে পড়েছিল ঝুমা। আর স্বাতী বিনিদ্র। কেবলই অশান্ত পায়চারি করেছেঘরময়।নিজের ছায়াদেখে কেঁপে উঠেছে বারবার। এক হিমশীতল ভয়াল শব্দহীনতার মধ্যে সে শুধু কমলের চিঠি পড়েছিল। কমল বড়মামার ছেলে রজতদার বন্ধু। থাকে ঘাটশীলায়। কপার মাইনসে ইঞ্জিনীয়ার। এক বছরের মধ্যে এই নিয়ে কমলের ছ'ছটা চিঠি এল। কালকের চিঠিটা রাতে অসংখ্যবার পড়েছে স্বাতী। পড়তে পড়তে ক্রমশ সে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

সরোজকান্তি নিজের ঘরেই বসেছিলেন। বাসি কাপড় ছেড়ে কোনমতে চুলে একটা আলগা খোঁপা করে ও ঘরে ঢুকল স্বাতী। এখন তার কিছুটা

সময় সরোজকান্তির জন্য বরাদ্দ। সরোজকান্তি আজকাল ভাল দেখতে পান না। চোখে অল্প ছানি পড়তে শুরু করেছে। সকালের জলখাবার শেষ না করা পর্যন্ত ওর পাশে বসে স্বাতী খবরের কাগজের হেড লাইন-গুলো পড়ে। আজ পড়তে গিয়ে থেকে থেকে গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছিল স্বাতীর। একবার ধরাও পড়ে গেল সে। সরোজকান্তি শুধোলেন, কী হল বউমা, শরীর ভাল আছে তো?

নিজেকে চমৎকার সামাল দেয় স্বাতী। আঙুলের ডগা দিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে বলে, কিছু না বাবা। চোখে হঠাৎ কি যেন একটা পড়েছে—

লক্ষ্মী মুদি দোকান থেকে ফিরে রান্নাঘরে ঢুকছে। প্রভাতীভ্রমণ শেষে বাজার করে বাড়ি ফেরেন সরোজকান্তি। অমলা বটি পেতে আনাজ কুটছে। লক্ষ্মীই দু'বেলা রান্না করে। অনেক বলেও স্বাতীকে রাজি করাতে পারেননি অমলা। আপত্তি সরোজকান্তিরও। কাঁচা বয়সের নরম শরীর। আগুনের আঁচে নষ্ট হয়ে যাবার ভয়।

সরোজকান্তিকে সামাল দিয়ে বসার ঘরে চলে এল স্বাতী। ঝুমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়ে বলল, কই, দেখি তো কি পড়া?

ঝুমা উঠে আলমারি থেকে ভূগোল বই আনতে চলে গেল ঘরের আরেক কোনে।

স্বাতীর সামনের দিকে জানালার পর্দাটা হাওয়ায় উড়ছে। দূরে কোথাও এক ফিরিঅলা সুর করে হেঁকে যাচ্ছে। জানালার ওধারে মাঠের শেষে একখণ্ড বড় নীলচে মেঘ উঁকি দিচ্ছে। মেঘ নয়, যেন এক পাহাড়ের চুড়ো। পায়রার দল ছাদে ডানা ঝাপটাচ্ছে। মুহূর্তে উন্মন হয়ে ওঠে স্বাতী। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আরেক ছবি। সুবর্ণরেখার কোল ঘেঁসে শাল-মহুয়ার সার। তার ওপরে উঁচু পাহাড়ের ঢেউ, যতদূর দৃষ্টি যায়। এদিকে খনিশহর ঘাটশীলা। উজ্জ্বল রৌদ্রে ঝলমল করছে। কই পড়া ধরবে না বৌদিভাই।—ঝুমার ডাকে ছবিটা ঝাপসা হয়ে যায়। অনেকক্ষণ হল ও ভূগোল বইয়ের পাতা খুলে বসে আছে সামনের

চেয়ারটায়। টের পায়নি স্বাতী। ওর দিকে চোখ পড়তে সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। ঝুমার মুখের ভেতর দিয়ে আরেকটা মুখ উঁকি মারে। সেটা সমীরের। কপালের দু'পাশের রগ-গুলোয় আগুন ছোটে। করুণ হেসে দাঁড়িয়ে উঠে বেপরোয়া বলে স্বাতী, আজ শরীরটা ভাল নেই। তুই পড়—

বারান্দায় নামতে মাঝের ঘর থেকে ডাকেন অমলা, এদিকে একবার আসবে বউমা।—অমলার হাতে জপের মালা। মাসকয়েক হল অমলা-সরোজকান্তি দীক্ষা নিয়েছেন। ধর্মকর্ম জপতপে সরোজকান্তির চেয়ে অমলার আগ্রহ বেশি। সমীর চলে যাবার আগেও স্বাতী ওকে দেখেছে। একেবারে অন্যরকম। হাসিখুশি, প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়ে সবাইকে মাত করে রেখেছেন। সংসারটা ছোট কিন্তু এই ছোট সুখী সংসারটুকু নিয়ে ওঁর কতই না গর্ব ছিল। স্বাতী আসার পর সরোজকান্তি অবসর নিলেন। বেসরকারি অফিসের চাকরি। কর্মকুশলতার জন্য কর্তৃপক্ষ সরোজকান্তিকে চাকরিতেআরো দু-বছরের এক্সটেনশন মঞ্জুর করেছিল। অমলাই করতে দেননি। বলেছেন: সারাটা জীবন তো চাকরি নিয়েই মেতে রইলে। ঘরে ছেলের বউ এল। নাতিনাতনিরাও আসবে। আর কাজ করতে হবে না।

এখন কিছুক্ষণের জন্য সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে একলা থাকতে চাইছে স্বাতী। কিন্তু প্রতিপদে বাঁধন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাঝের ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় স্বাতীকে। অমলা বললেন, অনেকদিন হয়ে গেল গুরুদেবের কোন খবর পাই না। একটা চিঠি লিখে দেবে বউমা?

স্বাতী হাসির আড়ালে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বলল, এখনই মা?

কেন, কোন কাজ আছে তোমার?—আঙুল চালানো বন্ধ করলেন অমলা।

না ভাবছি, বলতে গলায় স্বরে চিড় ধরল স্বাতীর, কদিন হল ঘরটা যা এলোমেলো হয়ে আছে—

ঘরে ঢুকে দরজার খিল আটকাল স্বাতী। সারা শরীরে কেউ যেন

বেহালার ছড় টেনে যাচ্ছে। কপাল জুড়ে প্রলেপের মত পুরু যন্ত্রণা। বিছানায় এসে গা এলিয়ে দিতে খোঁপাটা খুলে গেল। কিছুই ভাল লাগছে না স্বাতীর। হৃদ্‌পিণ্ডের ভেতর ঢাকের আওয়াজের মত থেকে থেকে ঢিবঢিব শব্দ হচ্ছে। একটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে গিয়ে বারবার সেই হারিয়ে ফেলছে সে।

ঘড়ির কাঁটা ধাতব শব্দ করে ঘর পালটাতে উঠে বসল স্বাতী। পিঠময় এলোচুল ছড়িয়ে পড়ছে। গলার ভাঁজে.কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জ্বরতপ্ত শরীর। মুখ তুলে তাকাতে দেয়ালে লটকানো ফটোটার দিকে চোখ পড়ল। একটা যুগল ফটো। তার আর সমীরের। বিয়ের পর পর তোলা। চোখ ফেটে জলের ধারা বেরুচ্ছে। নিজেকে সামলাতে গিয়ে আরো বেসামাল হয়ে পড়ল স্বাতী। কিন্তু কোথায় লুকোবে সে। এ বাড়ির সর্বত্রই যে সমীর ছড়িয়ে আছে নানাভাবে।

গত বৈশাখের কথা। বিয়ের পর পুরো ছ'মাসও পেরোয়নি। বিকেলের দিকে সেই ভয়ানক দুঃসংবাদ নিয়ে থানা থেকে পুলিশ এসেছিল। দরজা খোলেন সরোজকান্তি। সকালের ডিউটি সেরে ফিরছিল সমীর। শিয়ালদ'র মোড়ে ডবলডেকারের রাক্ষুসে দাঁতাল চাকার তলায় পড়ে যায়। প্রাণটা বেরিয়ে যেতে পাঁচ মিনিট সময়ও লাগেনি।

বুকের খাঁচাটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল স্বাতীর। দাঁড়াতে পা'দুটো টলতে লাগল। একটু হাওয়ার জন্য কোনরকমে সে পুবের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। বাইরে রোদ ঝলকাচ্ছে। পেঁপে গাছের ছায়ারা মাটিতে শাড়ির নকসা বুনছে। ছাদে পায়রার দল ডাকছে একটানা। বিষণ্ণ, গম্ভীর।

সমীরের মৃত্যুর পর বড়মামা এসেছিলেন নিয়ে যেতে। স্বাতী যায় নি। যেতে পারেনি। হাসিতে পাগলামিতে নিবিড়ভাবে মাস কয়েকের জন্য কাছে পাওয়া মানুষটার কথা ভেবে।

ঘুরে দাঁড়াল স্বাতী। বুকের ভেতর একটা ভারি রোলার চালাচ্ছে কেউ। এগিয়ে এল ফটোটার কাছে। স্মৃতি কি ভীষণ প্রতারক, নিষ্ঠুর।

বছর না ঘুরতেই মানুষটার জীবন্ত মুখটা বিবর্ণ, প্রাণহীন ঠেকছে তার কাছে। এখন যতদিন সে এই বাড়িতে থাকবে, ততদিন তাকে ওই মানুষটার নামের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁচে থাকতে হবে। এছাড়া তার আর কোন পরিচয় নেই, মূল্য নেই এ সংসারে। স্বাতী মুখ তুলে ভাল করে চাইল ফটোটার দিকে। তাকাতে শিউরে উঠল সে, বুকের ভেতরটা মুহূর্তে হিম হয়ে গেল। মনে হল, একটা মৃত মানুষের মুখের পাশে তার মুখটাকে যেন কেউ জোর করে চিরকালের জন্য সেঁটে দিয়েছে।

দুপুর গড়াতে অমলা তৈরি হয়ে নিলেন। বড় রাস্তার কাছে কালীবাড়ি। প্রতিদিন এসময় তিনি সেখানে যান শাস্ত্রপাঠ শুনতে। ফেরেন সন্ধ্যা করে। লক্ষ্মীও চলে গেছে। ওর বাড়ি রেল কলোনীতে। অমলা বেরিয়ে পড়তেই তড়িঘড়ি নিজের ঘরে ঢুকল স্বাতী। জানালা-গুলো সব বন্ধ করল প্রথমে। তারপর স্টিলের আলমারিটা খুলল। আলমারির নানা তাকে থরেথরে সাজানো সব বিয়েতে পাওয়া দামি কাপড়। একটা চাপা মিষ্টি সেন্টের গন্ধ ফুটে বেরুচ্ছিল আলমারি থেকে। স্বাতী একখানা সাধারণ শাড়ি বের করল। সেই সঙ্গে লকার থেকে সামান্য কিছু টাকা। দেয়ালঘড়ির পেণ্ডুলামটা বিশ্রী শব্দ করে করে দুলছে। কোনমতে চুল আঁচড়ে নিয়ে শাড়িটা পড়ে নিল সে। বারান্দায় এখন চৈত্রদিনের খর রোদ শুয়ে আছে। স্বাতী একবার উঁকি মারল মাঝের ঘরে। খাটে শান্ত ঘুমিয়ে আছেন সরোজকান্তি। ওর শিয়রের কাছের গোল টেবিলে রেকাবে ঢাকা সুজির পায়েস আর জল। সব ঠিকঠাক গুছিয়ে রেখেছে স্বাতী। যাতে বিকেলের দিকে ঘুম ভেঙে যেতে সরোজকান্তি সবকিছু হাতের কাছে পান।

বারান্দা থেকে নেমে পড়ে খিড়কির দরজার দিকে এগিয়ে যাবার সময় থেকে থেকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল স্বাতী। পায়ে আঁশের মত একটা কিছু যেন জড়িয়ে যাচ্ছিল বারবার। মাথার কিছুটা ওপরে সমীরের প্রিয় পায়রাটা অনবরত পাক খাচ্ছে। ওর পায়ে বাঁধা রুপোর মলদুটো বাজছে

ঝুমঝুম করে। বিকেলের রঙ মরে যাবার পর পায়রাটা ছাদের চোখুপির ভেতর ঢুকে যাবে। খিড়কির দরজাটা খুলে একেবারের জন্য পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল সে বাড়িটাকে। ঝুমা ফিরলে এ বাড়ির নিস্তব্ধতা ভাঙবে। সে আরো ঘন্টাদেড়েক বাদের কথা। ছুটির পর স্কুলগেটের মুখে দাঁড়িয়ে ঝুমা স্বাতীর জন্য অপেক্ষা করবে কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় একাই চলে আসবে। এসে সোজা বাড়িতে ঢুকবে না। বাড়ির সামনের দিকের রাস্তার ধারে শিরীষ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে অভিমানে ভেজা ভেজা গলায় ডাকবে বার কয়েক, বৌদিভাই, বৌদি-ভাই —। ওকে আর মাকড়সা মেয়ের গল্পটা বলা হল না। কাল রাতে শুরু করেছিল বলতে। রূপকথার এক অদ্ভুত মেয়ের গল্প। যে মেয়ে দিনেরবেলায় মেয়ে আর রাত হলেই মাকড়সা হয়ে যায়। শুনতে শুনতে কাল মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঝুমা।

প্রগতি সঙ্ঘের মাঠে নেমে জোরে পা চালায় স্বাতী। দূরে রেল স্টেশনের করোগেটের শেডের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। মাথার ওপর চৈত্রশেষের আসন্ন বিকেলের পিঙ্গল আকাশ। আরেকবার দাঁড়িয়ে পড়ে পিছু ফিরে বাড়িটাকে দেখতে ইচ্ছা করছিল স্বাতীর। কিন্তু দাঁড়াল না সে। কী আছে পেছনে? এক মৃত মানুষের অদৃশ্য উপস্থিতি সারা বাড়িটা জুড়ে। স্বাতী চলার গতি আরো বাড়িয়ে দিল। সামনের ঘাসে ছাওয়া পৃথিবীটা ভারি সুন্দর। নাগরদোলায় চড়লে যেমন হয় তেমনি স্বাতীর চোখের সামনে কিছু ছবি পরপর ফুটে উঠতে লাগল। দূরে অসমান পাহাড়ের ঢেউয়ের নিচে শেষবেলার রোদে ঝলমল করছে বনভুমি, সুবর্ণরেখা। তার এপারে কপার মাইনস, মৌভাণ্ডার, বাবুলাইস, একটি তাজা যুবকের উজ্জ্বল মুখ, উচ্ছল জীবন।

প্ল্যাটফরমে উঠে আসতে স্বাতী দেখল, দূরে বাঁকের আড়াল থেকে একটা ট্রেন তীব্রগতিতে ছুটে আসছে স্টেশনের দিকে। দিশেহারা স্বাতী একটা পলকা গাছের মত কাঁপতে লাগল।

---